জিহাদ

জিহাদ কী?

আরবীতে জিহাদ শব্দটির মূল হল 'আল্ জাহ্দু'। যার শাব্দিক অর্থ চূড়ান্ত চেষ্টা বা শ্রম ব্যয় করা। এর ইসলামিক পারিভাষিক অর্থ হল মানবকল্যাণে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। এক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি দুটোকেই একসাথে সমান প্রাধান্য দিতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে যে শ্রম ব্যয় করা হবে সেটাই হবে জিহাদ। জিহাদের অনেকগুলো স্তর আছে। প্রথম স্তরে রয়েছে রিপু, প্রবৃত্তি এবং পশুত্বর বিরুদ্ধে নিজের ভিতরে মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটানোর জন্য সংগ্রাম বা চেষ্টা। এটাকে বলা হয় 'জিহাদ বিন নফ্স্' অর্থাৎ নফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। নবী করীম (সা.) জিহাদ বিন নফ্স্কে 'জিহাদে আকবর' বলে অভিহিত করেছেন।

روى البيهقي في كتاب الزهد عن جابر رضي الله عنه قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة ، فقال صلى الله عليه وسلم قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر . قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟
قال : مجاهدة العبد هواه □

বায়হাকী 'কিতাবুয যুহদে' হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যুদ্ধ সমাপ্তকারী এক দল এল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ছোট জিহাদের থেকে বড় জিহাদের প্রতি তোমাদের আগমন শুভ হোক। তারা বলল, বড় জিহাদ কোনটি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ।

হাদীস নং ৩৮৩

তিনি আরও বলেন –

عن فضالة بن عبيد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه □

মুজাহিদ হল ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নিজের কুপ্রবৃত্তি ও নফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।

সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৬২১

জিহাদ কত প্রকার ও কী কী?

লেখার মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার নাম 'জিহাদ বিল কালম'। অর্থাৎ একজন কলম বা লেখনীর মাধ্যমে তার জিহাদ পরিচালনা করল। আরও আছে 'জিহাদ বিল লিসান' অর্থাৎ বাচনিক যুক্তির মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা। সে একজনকে বলতে পারে যে তুমি যা করছ সেটা অন্যায় করছ। অন্য আরেক প্রকার জিহাদ হল 'জিহাদ বিল ইয়াদ', মানে হাতের দ্বারা, অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে জিহাদ করা। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯) এই জিহাদের দায়িত্ব হল সরকারের। আর 'জিহাদ বিল কালম' এবং 'জিহাদ বিল লিসান'-এর দায়িত্ব হল আলেম, ওলামা এবং বুদ্ধিজীবীদের। আর প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব হল নিজের নফ্সের বিরুদ্ধে, নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এই জিহাদে অংশগ্রহণকারী একজন মুসলমান যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে সে মানবিক গুণাবলির পাশাপাশি আল্লাহ্‌র প্রেমের গুণাবলি, আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার গুণাবলি, আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের গুণাবলির দাওয়াত দিবে সকলকে। তবে দাওয়াত দিতে গিয়ে কারও উপর জবরদস্তি করা যাবে না। কারণ দ্বীন ও ইসলামের বিষয়ে জোর-জবরদস্তির কোনো অবকাশ নেই। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ □

দ্বীন ও ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।

সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬

এ বিষয়ে ইসলামের মূলনীতি হল–

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ □

মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে এবং সদুপদেশ দ্বারা উত্তমরূপে, আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়।

সূরা নাহল, আয়াত ১২৫

একজন মু'মিনের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে সাথে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ বন্ধ করা। তাই হাদীসে রসূল (সা.) বলেছেন, মজলুম সে মুশরিক (পৌত্তলিক অর্থে) না মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা কাফের এটা কোনো প্রশ্ন নয়। একজন মজলুম সে যেকোনো লোকই হোক তার সাথে আছি আমি। আরেকজন জালেম সে যদি মুসলমানও হয় তাহলে আমি তার সাথে নেই। এক হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন–

ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ◻

সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের উপর কোন প্রকার জুলুম করবে অথবা তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করবে কিংবা তার সাধ্যাতীত কোন কাজে তাকে বাধ্য করবে অথবা তার থেকে কিছু জোর করে ছিনিয়ে নিবে, কেয়ামতের দিন আমি নিজে সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়ব।

সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০৫২

আরেক হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب ◻

মজলুমের বদদু'আ থেকে বেঁচে থাকো যদিও সে কাফের হয়, কেননা তা কবুল হওয়ার মাঝে কোন আড়াল থাকে না।

মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১২১৪০

আর ইসলামী সরকারের দায়িত্ব ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, শোষণহীন রাষ্ট্র এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। আল কুরআনের বহুস্থানে জুলুম প্রতিহত করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ রয়েছে-

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ◻

যদি বিচার করেন তবে ন্যায়ভাবে বিচার করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।

সূরা মায়েদা, আয়াত ৪২

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ◻

তাদের মাঝে ন্যায়ানুগ পন্থায় ফয়সালা করবে এবং ইনসাফ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ◻

নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।

সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ৮

ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় জিহাদের কী কী লক্ষ্য হাসিল করতে হবে?

জিহাদের অন্যতম লক্ষ্য হল অত্যাচারী, সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী শক্তিকে দমন ও প্রতিহত করা। কুরআনে করীমের আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ◻

যেহেতু তারা নির্যাতিত তাই তাদের অনুমতি দেয়া হল যে, তারা জালেমদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে।

সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৯

অর্থাৎ নিপীড়কদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে নির্যাতিতরা লড়াই করবে।

দ্বিতীয় লক্ষ্য হল শোষিত এবং মজলুমদের রক্ষা করা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ◻

তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে না দুর্বল অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এই জনপদ– যার অধিবাসীরা জালিম, অত্যাচারী– থেকে পরিত্রাণ দাও, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

ইসলামের একটি অন্যতম মূলনীতি হল, তুমি নিজে জুলুম করবেও না, আবার কেউ তোমার উপর জুলুম করবে সে সুযোগও দিবে না।

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমরা নিজেরাও নির্যাতিত হবে না।

সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৯

আল্লাহ্ বলেছেন, যদি তস্করদের প্রতিহত না করা হয় তাহলে গির্জা, প্যাগোডা ও মন্দিরগুলিকে তারা ধ্বংস করে ফেলবে। এই অপশক্তি মসজিদগুলোকেও ধ্বংস করে দিবে। অর্থাৎ কেবল মসজিদ রক্ষার জন্যই নয়, আল্লাহ্ পাক বলছেন, গির্জা, প্যাগোডা এবং মন্দির তথা যেকোনো উপাসনালয় রক্ষা করাটাও জিহাদ। এটা জিহাদের তৃতীয় উদ্দেশ্য।

বাইশ নম্বর সূরার চল্লিশ নম্বর আয়াতে এই সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন শরীফের আয়াতে স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ আছে। সূরা হজ্জের এই আয়াতে খ্রিস্টান, ইহুদিসহ অপরাপর সম্প্রদায়সমূহের উপাসনালয়ের কথা মুসলিমদের ইবাদত এবং মসজিদসমূহের আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয় গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয়, মন্দির অগ্নি উপাসকদের এবং মসজিদসমূহ যেখানে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান এবং পরাক্রমশালী।

সূরা হজ্জ, আয়াত ৪০

অমুসলিমদের উপাসনালয়গুলো রক্ষা করাও মু'মিনের দায়িত্ব। যেখানে কুরআনে একথা বলা আছে সেখানে মন্দির ভাঙ্গার হুকুম কোথায়? এই

দেশে বা বিশ্বব্যাপী যারা অন্য সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ধ্বংস করছে, তারা ইসলামের পথে নেই।

জিহাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হল সন্ত্রাসের মূল উৎপাটন। সূরা বাকারার ১৯৩ নম্বর আয়াতে বলা আছে–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ۝

ফিতনা ও সন্ত্রাস দমন না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করে যাও।

সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৩

একজন মুসলমানের জন্য জিহাদ কখন ফরজ হয়ে দাঁড়ায়?

নিজের নফস্ বা রিপুর বিরুদ্ধে জিহাদ সব সময় ফরজ। কিন্তু জিহাদ বলতে সাধারণভাবে যে সশস্ত্র সংগ্রামকে বোঝানো হয়, ইসলামের পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'কিতাল'।

যারা সহনশীল সমাজ উৎখাতে লিপ্ত হয়, সহাবস্থানমূলক সমাজ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, জাতিগত এবং সাম্প্রদায়িক জেদে অন্ধ হয়ে জনপদ ধ্বংসের মতো অপরাধে লিপ্ত হয়, তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম সশস্ত্র সংগ্রাম বা যুদ্ধের অনুমতি দেয়, যা ইসলামের পরিভাষায় 'মুকাতালা' নামেও প্রসিদ্ধ। এটি হল শেষ ধাপ।

এই ধাপে আসার শর্ত কী কী?

সমগ্র জাহানের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়া একজন মু'মিনের পবিত্র দায়িত্ব। দাওয়াতের স্তর পার না হয়ে কিতালে শামিল হওয়া অবৈধ (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩১)। ইসলাম শান্তির ধর্ম। বিরুদ্ধপক্ষ যদি সহাবস্থানে সম্মত হয়, সন্ধিতে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলেও সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয়া যাবে না (সূরা আনফাল, আয়াত ৬১)। কেবল প্রতিপক্ষ যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় এবং আর কোনো পথ খোলা না থাকে

তখনই কিতালের ঘোষণা আসতে পারে। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় একে বলা হয়েছে 'হাসান লিগাইরিহি' অর্থাৎ এমন একটি কাজ বা মূলত উত্তম নয়, তবে মহান একটি উদ্দেশ্য সাধনে অনন্য উপায় হয়ে এটিকে বৈধ করা হয়েছে (আল বাহরুর রা'ইক, পঞ্চম খণ্ড, অধ্যায় : জিহাদ)।

আরও একটি শর্ত হল, কিতালের ক্ষেত্রে অবশ্যই পশ্চাদ্ভূমি থাকতে হবে। যে ভূমিতে যুদ্ধ শেষের পর আবার ফিরে আসার সুযোগ থাকে। আর যেখান থেকে প্রস্তুত হয়ে আবার যুদ্ধে যাওয়া যেতে পারে। যদি পশ্চাদ্ভূমি না থাকে, তখনও কিতালের আহ্বান বা ঘোষণা দেয়া যাবে না। সূরা আনফালের ১৬ নং আয়াতের উপর ভিত্তি করে ফকীহগণ এটা বলেছেন। তৃতীয় শর্ত হল, যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই হতে যাচ্ছে তার মতো প্রস্তুতি থাকতে হবে, অস্ত্রবল, জনবল, বুদ্ধিবল বা বাহিনী যদি প্রতিপক্ষের কাছাকাছি না হয় তাহলেও কিতালের ঘোষণা দেয়া যায় না। সূরা আনফালের ৬৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

কে কিতালের ঘোষণা বা ডাক দিতে পারেন?

কিতাল হচ্ছে জিহাদের শেষ ধাপ। যেহেতু এর সঙ্গে মু'মিনদের জান-মালের হেফাজতের প্রশ্ন জড়িত, কাজেই যে কেউ কিতালের ডাক দিতে পারবে না। কিতালের ডাক দিবেন আমীর, যিনি প্রশাসনিক প্রধান। অর্থাৎ মুসলমানদের একজন নির্বাচিত আমীর থাকতে হবে। এই আমীর যুদ্ধের ঘোষণা দিবেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه

ইমাম বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী মুসলিম নেতা হলেন জাতির জন্য ঢালস্বরূপ। তাঁরই (নির্দেশের) আড়ালে যুদ্ধ করা যাবে এবং তাঁরই (নির্দেশের) মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা হবে। তিনি যদি আল্লাহর প্রতি তাকওয়া ও পরহেজগারীর মাধ্যমে নির্দেশ দেন তাহলে তিনি প্রতিদান ও সওয়াবপ্রাপ্ত হবেন। আর যদি অন্যরূপ করেন তবে তাঁর অন্যায়ের দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্তাবে।

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪১

ইসলাম এতখানি সহনশীল এবং শান্তির বার্তা দেয় যে, একজন সাধারণ মু'মিনও অমুসলিম গোষ্ঠীকে নিরাপত্তা দিতে পারেন। একবার কেউ যদি নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে তার আমীরের জন্যও এই নিরাপত্তাকে সম্মান দেখানো অবশ্য কর্তব্য হবে। আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) তার উদাহরণ রেখে গেছেন।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আলী (রা.)-এর বোন উম্মে হানীর স্বামীর দিক থেকে বিধর্মী কিছু আত্মীয় ছিল যাদেরকে হযরত আলী (রা.) হত্যা করতে উদ্যত হলে উম্মে হানী বললেন যে, আমি এদেরকে আশ্রয় দিয়েছি। তিনি উম্মে হানীর এই আশ্রয় প্রদানের বিষয়টিকে নাকচ করে দেন। তখন হযরত উম্মে হানী গেলেন রসূল (সা.)-এর কাছে। রসূল (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে নিবৃত্ত করলেন এবং বললেন, কোনো মুসলমানের আশ্রয়ে থাকা কারও ন্যূনতম ক্ষতি করা তো দূরের কথা, বরং তাকে রক্ষার দায়িত্ব পুরো মুসলিম সমাজের কাঁধেই বর্তায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০০০)

জিহাদে আকবর ও জিহাদে আসগরের মধ্যে পার্থক্য কী?

আরবী 'আকবর' শব্দের অর্থ হল বড় আর 'আসগর' মানে ছোট। শাব্দিক অর্থে আকবর হল মর্যাদায় বড়, বয়সে বড় বা আকারে বড়। আর এর বিপরীত হল আসগর। এখানে 'জিহাদে আকবর' বলা হয়েছে নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াইকে। আর 'কিতাল' বা সশস্ত্র যুদ্ধ হল এতদপ্রেক্ষিতে 'জিহাদে আসগর'।

এক যুদ্ধ শেষে মুসলিমদের একটি বাহিনী যখন মদিনায় ফিরে আসল, রসূল করীম (সা.) তাঁদের বললেন, "তোমরা তো ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে এসেছ।" অর্থাৎ এই যে সশস্ত্র সংগ্রামে তোমরা ছিলে এই সশস্ত্র যুদ্ধটা আসলে ছোট। আর তোমার নিজের বিরুদ্ধে, তোমার রিপু এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তোমার ভিতরের মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে তোমার যে সংগ্রাম সেটা হল বড় যুদ্ধ।

روى البيهقي في كتاب الزهد عن جابر رضي الله عنه قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة ، فقال صلى الله عليه وسلم قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر . قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : مجاهدة العبد هواه □

বায়হাকী 'কিতাবুয যুহদে' হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যুদ্ধ সমাপ্তকারী এক দল এল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ছোট জিহাদের থেকে বড় জিহাদের প্রতি তোমাদের আগমন শুভ হোক। তারা বলল, বড় জিহাদ কোনটি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ।

হাদীস নং ৩৮৩

খিলাফত কাকে বলে?

পবিত্র কুরআনে খিলাফত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি অর্থে। এটি সকল মনুষ্য জাতিকে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন মনুষ্য সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করেন তখন ফেরেশতাদের তিনি অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা অর্থাৎ আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই (সূরা বাকারা, আয়াত ৩০) যা হচ্ছে মানুষ-আশরাফুল মাখ্লুকাত। এখানে কোনো জাত-পাতের প্রশ্ন আসেনি। মানুষ মাত্রই আল্লাহ্ তা'আলার খলীফা। আল্লাহ্ তা'আলার যে গুণবাচক নামগুলি আছে এর প্রতিনিধিত্ব করে সে দুনিয়াতে। আল্লাহ্ নিজে খান না, অন্যকে খাওয়ান। তুমিও নিজে না খেয়ে হলেও অন্যকে আহার করাও। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, তুমিও অন্যকে ক্ষমা কর। আল্লাহ্ সহমর্মী, সহানুভূতিশীল, তুমিও অন্যের প্রতি সহমর্মী এবং সহানুভূতিশীল হবে। প্রতীকী ঐ গুণবাচক নামগুলির প্রতিফলন মানুষের চরিত্রে পরিলক্ষিত হবে। এর নামই হল খলীফা।

রসূল করীম (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন কিন্তু কাউকে উনি রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করে যাননি। অনেকে বলে যে হুজুর একজনকে নির্বাচন করে গিয়েছিলেন, কিন্তু এটা সঠিক না। রসূল (সা.) প্রায় বেশ কয়েক দিন অসুস্থ

ছিলেন। এই সময়ে অনেকেই তাকে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু রসূল (সা.) কাউকে নির্বাচিত করে যাননি (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৯২)। পরবর্তীতে রসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে ঐদিনই মুহাজির এবং আনসারসহ সকলে প্রতিনিধি নির্বাচন সভায় বসেন। আনসাররা দুইজন প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রস্তাব করেছিলেন। যারা আনসার এবং মুহাজিরদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সবাই একমত হলেন যে প্রতিনিধি একজনই হবেন। হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিনিধি হিসেবে হযরত ওমর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) কোনো প্রস্তাব না দিয়ে সরাসরি হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে হাত রেখে খলীফা হিসেবে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৬৭)। বাকি সাহাবায়ে কেরামও হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নিলেন। হযরত আলী (রা.)-ও প্রকাশ্যে মসজিদে নববীতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৫৯)।

খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলা হত 'খলীফাতু রসূলিল্লাহ' অর্থাৎ রসূল করীম (সা.)-এর প্রতিনিধি। এরপর যখন হযরত ওমর আসলেন তাকে বলা হত 'খলীফাতু খলীফাতি রসূলিল্লাহ', রসূলের প্রতিনিধির প্রতিনিধি। কয়েক বছর পরে হযরত ওমর ভাবলেন, এভাবে চললে এর পরের সবার নাম অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই উনি সকলকে প্রস্তাব দিলেন, মুসলমানদের প্রতিনিধির একটি নাম নির্বাচন করার জন্য। তখন সবাই মিলে প্রস্তাব পাশ করলেন, মুসলিমদের প্রতিনিধিকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হবে। যে হবে বিশ্বাসীদের কর্তা, বিশ্বাসীদের নেতা। আমাদের দেশে আমীর বলতে যেমন বিলাসী জীবন যাপনকে বোঝায়, আরবীতে কিন্তু তা না। আরবীতে বলা হয়, যিনি নির্দেশ দেয়ার অধিকার রাখেন। 'আল-আম্‌র' মানে নির্দেশ দেয়া।

খলীফা শব্দটির ব্যবহার হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়েই শেষ হয়ে যায়। যেহেতু হযরত আবু বকর (রা.)-কে দিয়ে এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার শুরু, এ কারণেই এটিকে বলা হত খিলাফত। হযরত আবু বকর (রা.) থেকে শুরু করে হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত এই চারজনের শাসনামলকে বলা হয় 'খিলাফতে রাশেদা'। হযরত মুআবিয়া (রা.) থেকে শুরু হয় উমাইয়া শাসন। তিনি ছিলেন আমীর অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্নর, তাই তাঁকে 'আমীরে মুআবিয়া' বলা হত। আর আমীর শব্দটি থেকেই এসেছে ইমারাত। যে কারণে উমাইয়া সাম্রাজ্যকে বলা হত 'ইমারাত'। পরবর্তীতে অবশ্য আব্বাসীয়রা তাদের নামের সাথে খলীফা এবং আমীর উভয় পদবিই ব্যবহার করে।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য নিরপরাধ নারী-শিশু হত্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

ইসলামে এ ধরনের আচরণ হারাম। ফিতনা, ফাসাদ, হত্যা এগুলো ইসলামে পছন্দনীয় নয়। কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে যে, একজনকে কেউ যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহলে সেটা গোটা মনুষ্য জাতিকে হত্যার সমান। আর একজনকে যদি সে বাঁচায় তাহলে গোটা মনুষ্য জাতিকে রক্ষা করার সমান। ইসলামে হত্যাকে জঘন্য আর মানুষকে বাঁচানো সম্মানের বলা হয়েছে।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا □

একটি মানুষকে হত্যা গোটা মনুষ্য জাতিকে হত্যার নামান্তর এবং একটি মানুষের প্রাণরক্ষা গোটা মনুষ্য জাতির প্রাণরক্ষার নামান্তর।

সূরা মায়েদা, আয়াত ৩২

লক্ষ করার মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পবিত্র কুরআন মজীদের কোথাও ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠাকে সুনির্দিষ্টভাবে মুসলমানদের লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। আয়াতে বলা আছে, তোমরা যদি সদগুণের অধিকারী হও, আল্লাহ্ মেহেরবানি করে তোমাদের ক্ষমতার অধিকারী করবেন। এটি হল পুরস্কার। বরং মানবিক গুণগুলি যদি তুমি ইবাদত এবং নামাজের সাথে সাথে অর্জন কর তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে অবশ্যই ক্ষমতার অধিকারী করবেন।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে শাসন-কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি শাসনভার দান করেছিলেন তাদের পূর্বসূরিদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোনো শরিক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্য-ত্যাগী। তোমরা নামায আদায় কর, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পার।

সূরা নূর, আয়াত ৫৫-৫৬

খিলাফত বা শাসন প্রতিষ্ঠা করা নয়, বরং যিনি বা যারা শাসন করবেন, মু'মিন হিসেবে তাদের ইবাদত এবং মানবিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত গুণাবলি অর্জন করতে হবে। তারা যদি তা অর্জন করতে পারে তাহলে আল্লাহ্ পাক ওয়াদা করেছেন যে, এ ধরনের লোকদের তিনি ক্ষমতার অধিকারী করবেন।

আত্মঘাতী হামলা কি জায়েজ?

মৌলিকভাবে ইসলামে আত্মহননকে কবিরা গুনাহ্ বলা হয়েছে। কবিরা গুনাহ্ হল সবচেয়ে বড় গুনাহ'র একটি। সাধারণভাবে যে যত বড় অপরাধই করুক, তার জানাজা পড়ার হুকুম আছে, কিন্তু কেউ যদি আত্মহত্যা করে তাহলে তার জানাজা পড়ারও হুকুম নেই ইসলামে। অর্থাৎ শাস্তি হিসেবে ঐ ব্যক্তির জানাজাও পড়া হবে না। এটা শরীয়তের স্পষ্ট হুকুম। রাষ্ট্রদ্রোহী, ডাকাত, ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী, পিতা-মাতার হত্যাকারী এবং আত্মহত্যাকারীর জানাজা পড়া যাবে না। (ফতওয়ায়ে শামী, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ : জানাজার নামাজ ও আল বাহরুর রা'ইক, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ : শহীদের জানাজা) আবার, কুরআন মজীদেও স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে–

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ◻

নিজেদের হত্যা কর না, আল্লাহ্ তোমাদের উপর দয়াশীল।

সূরা নিসা, আয়াত ২৯

ইসলামের দৃষ্টিতে নিজেকে মানববোমা বানিয়ে উড়িয়ে দেয়া কখনোই বৈধ নয়। রসূল (সা.)-এর সঙ্গে জিহাদে শরিক এক লোক যুদ্ধে আহত হয়ে আত্মহত্যা করলে নবীজী তৎক্ষণাৎ তাকে জাহান্নামী বলে ঘোষণা দেন (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৪২)। সুতরাং এই ধরনের কাণ্ড কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। আত্মহত্যা করে যে মৃত্যুবরণ করবে সে কখনোই মহান শহীদদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার মৃত্যু শহীদী মৃত্যু বলে ইসলামে গণ্য নয়।

জঙ্গিরা কোন আয়াতসমূহকে তাদের কর্মকাণ্ডের সমর্থনে ব্যবহার করে?

এরা প্রধানত কয়েকটি আয়াত আর হাদীসের একটি ঘোষণার অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষ হত্যার বিষয়টিকে জায়েজ করার চেষ্টা করে। এই অপব্যাখ্যাটি এসেছিল চল্লিশ হিজরী সনের দিকে। একদল লোক এই আয়াতের এই অপব্যাখ্যা দিয়েই হযরত আলী (রা.)-কে কাফের ঘোষণা দিয়েছিল এবং তাকে হত্যা করেছিল। আজকের দিনে আইএস, আল কায়েদা, বোকো হারাম, হিজবুল্লাহ, লস্কর-ই-তাইয়েবাসহ অন্যান্য মুসলিম নামধারী উগ্রবাদী গোষ্ঠীও নতুন কিছু করছে না। তখন যেমন ঐ আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল, এখন এরাও আজকাল এই বিকৃত ব্যাখ্যাই দেয়। তখন সাহাবায়ে কেরামগণ যে জওয়াব দিয়েছিলেন, মুসলিম উম্মাহর বুজুর্গ মাওলানা-মুফতী-আলেমগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আজও একই ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

এরা এই ক্ষেত্রে যে আয়াতগুলো দিয়ে বেশি বিভ্রান্ত করে সেগুলো হল, সূরা তওবার ৫ নম্বর আয়াত। অথচ সূরা তওবার ১-১৫ নম্বর আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা নিজেরাই হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ বনু খোযার উপর আক্রমণ করে। ফলে সন্ধিচুক্তি বাতিল হয়ে যায়। তাদের এজাতীয় কার্যাবলির জন্য তাদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

দুই-তিন নম্বর আয়াতে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে ঐ মুশরিকদের চার মাসের সময় দেয়া হয় এবং এই চার মাসে তারা শান্তি স্থাপন করলে বা ঈমান গ্রহণ করলে তাদের সাথে কোনো যুদ্ধ হবে না বলেও আয়াতগুলোতে নির্দেশ দেয়া হয়।

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ □

তোমরা চার মাস পরিভ্রমণ কর। আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারবে না আর নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রসূলও। তবে যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তা তোমাদের জন্যও কল্যাণকর।

সূরা তওবা, আয়াত ২-৩

পাঁচ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ □

চার মাসের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর যেসব কাফের-মুশরিক নির্দেশনা মানবে না তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধের সময় তাদের যেখানে পাও সেখানে হত্যা কর।

সূরা তওবা, আয়াত ৫

যুদ্ধের স্বাভাবিক বিধানই এটা যে, যুদ্ধের সময় শত্রুকে হত্যা করা হবে। অন্যথায় শত্রুই মু'মিনদের হত্যা করবে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে মক্কার ঐ মুশরিকদের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথা মুসলমানদের সাথে চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কিন্তু যারা তাদের চুক্তিতে দৃঢ় ছিল সেই মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নিতে নিষেধ করা হয়েছিল। ৪ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে –

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ □

> তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর।
>
> সূরা তওবা, আয়াত ৪

ইবনুল আরাবী তাঁর 'আহকামুল কুরআন' নামক কিতাবে এই আয়াতের তাফসীরে লেখেন, এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য হল, যেসব মুশরিক আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করে আপনিও তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। "যদি কোনো মুশরিক আপনার কাছে আশ্রয় চায় আপনি তাকে আশ্রয় দিন যেন সে আল্লাহ্‌র কালাম শোনে। এরূপভাবে তার নিরাপত্তার স্থানে তাকে পৌঁছে দাও। কারণ তারা এমন জাতি যারা জানে না।"

কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সাঈদ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত যে, একজন মুশরিক আলী (রা.)-এর কাছে এসে বলল, যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে চায় এবং আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে চায় কিংবা কোনো প্রয়োজন নিয়ে আসে তাহলে কি তাকে হত্যা করা হবে? আলী (রা.) বললেন, না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ☐

> যদি কোনো মুশরিক আপনার কাছে আশ্রয় চায় আপনি তাকে আশ্রয় দিন যেন সে আল্লাহ্‌র কালাম শোনে। এরূপভাবে তাকে তার নিরাপত্তার স্থানে পৌছে দাও। কারণ তারা এমন জাতি যারা জানে না।
>
> সূরা তওবা, আয়াত ৬

এখন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু উগ্রবাদী গোষ্ঠীও এই আয়াতটিকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে। এ দেশের বিধর্মীদের সবাই ইসলামী পরিভাষায় কাফের এবং মুশরিক। কারণ প্রচলিত খ্রিস্টধর্মে ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরিক করা হয়েছে। আর যেহেতু হিন্দুধর্মের অনুসারীগণ

মূর্তিপূজারী, কাজেই তারাও মুশরিক।

আর একটি হাদীসের ঘোষণাকেও তারা ব্যবহার করে। যেখানে রসূল (সা.) বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার না করা পর্যন্ত আমি লড়াই করতে নির্দেশিত হয়েছি'– বুখারী ও মুসলিম। এই হাদীসকে ব্যবহার করে তারা এটিকেই কুরআন এবং সুন্নাহ নির্দেশিত জিহাদ বলে ঘোষণা করছে এবং বলছে, এই নির্দেশ অনুসারে কিয়ামত পর্যন্ত লড়াই করতে তারা নির্দেশিত হয়েছে। এটি তাদের আরেকটি মারাত্মক জঘন্য অপকর্মের প্রমাণ। মহান আয়াতকে শানে নুযুল থেকে বিচ্ছিন্ন করে, খণ্ডিতভাবে পেশ করার কারণে এ ধরনের ভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নাজিল হওয়া এই আয়াত এবং হাদীসের অর্থ সাধারণভাবে প্রযোজ্য নয়। তৎকালে ইসলামের যে শত্রুবাহিনী যুদ্ধরত বা কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদে সন্ধিভুক্ত ছিল, কিন্তু সন্ধির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মেয়াদ বাড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তারা আবার যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যারা অন্যায়ভাবে স্বীকৃত সন্ধির শর্তভঙ্গ করেছে তাদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত এবং হাদীস প্রযোজ্য।

জিহাদ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্সে বারবার ঘুরেফিরে মু'মিন শব্দটি আসছে। তাহলে ফিতনা, ফাসাদ, কিতাল ও জিহাদের প্রসঙ্গে একজন মু'মিনের দায়িত্ব কী?

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন–

المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم □

মু'মিন হল সে, যার থেকে অন্য মানুষের জান ও মাল নিরাপদ থাকে।

মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৮৭১২

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই তার নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি জীবজন্তু এবং প্রাণীমাত্রই তার কাছে নিরাপদ। অনর্থক অপ্রয়োজনে কাউকে সে কষ্ট দেয় না, আঘাত দেয় না। এখানে সামান্য একটি পশুর কষ্টও অসহনীয়

এবং দণ্ডনীয়। একটি হাদীসে রসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده □

প্রকৃত মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যার জবান ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০

এই হিসেবে ইসলামের অধিকারী একজনের মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যাবশ্যক বলে পরিগণিত।

মানবকল্যাণ সাধনের জন্যই নবী করীম (সা.)-এর উম্মত জাতির আবির্ভাব, মুসলিম উম্মাহ্‌র অভ্যুদয়। কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে এই উম্মাহ্‌র আবির্ভাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ □

তোমরা তো উত্তম এক উম্মাহ, মনুষ্য জাতির কল্যাণ সাধন, তাদের উপকারার্থেই তোমাদের অভ্যুদয়।

সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০

প্রণিধানযোগ্য যে, এ কথা বলা হয়নি 'উখরিজাত লিলমুসলিমীন' মুসলিমদের, কেবল বিশ্বাসীদের কল্যাণ সাধনের জন্য তোমাদের অভ্যুদয়, বরং বলা হয়েছে 'উখরিজাত লিননাস'– সব মানুষের জন্য, সমস্ত ইনসানিয়াতের কল্যাণ সাধনের জন্যই, হে কওম, হে উম্মাহ, তোমাদের আগমন। কোনো বিশেষ বিশ্বাস-অধিকারীদের জন্য নয়, কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীর জন্য নয়, কোনো বিশেষ বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলের জন্য নয়, ধর্ম-ভাষা-বর্ণ অঞ্চল নির্বিশেষে সব মানুষের কল্যাণ সাধনই তোমাদের অবির্ভাবের লক্ষ্য।

একটি হাদীসে এই ভাবটিকে, এই ব্যঞ্জনাটিকে আরও প্রসারিত, আরও বিস্তৃত করে ইরশাদ হয়েছে–

الدين النصيحة □

দ্বীন হল, ইসলাম হল নসীহতের নাম। খায়েরখাহী এবং কল্যাণকামিতার নাম।

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫; সহীহ বুখারী, ঈমান অধ্যায়

এই খায়েরখাহী সর্বত্র, এই কল্যাণকামিতা সকলের, কল্যাণ সাধন সর্বশ্রেণির। যত মাখলুক আছে, যত সৃষ্টি আছে সবার ক্ষেত্রেই হবে একজন মু'মিনের এই মনোবৃত্তি।

ইসলাম ও অন্য ধর্মের সহাবস্থান

অন্য ধর্মের সঙ্গে সহাবস্থানের প্রশ্নে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?

ইসলামের সুমহান আদর্শ ও শান্তির পথে অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত পৌছে দেয়া একজন মু'মিনের দায়িত্ব। তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্যদের দাওয়াত দিবেন। এই দাওয়াত কার্যক্রম চলাকালে সমাজে কয়েক ধরনের লোক দেখা যাবে। এক ধরনের লোক থাকবে যারা মু'মিনের আহ্বানের সাথে ঐক্যমত পোষণ করবে। তারা তখন ভাই ভাই হয়ে যাবে। মু'মিনের যে অধিকার তখন তারও সেই অধিকার হবে। দ্বিতীয় ধরনের লোক থাকবে যারা মু'মিনের আহ্বানকে গ্রহণ করল না ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে সহাবস্থানে বিশ্বাসী। অন্যদিকে একজন মু'মিনও তার সাথে সহাবস্থানে বিশ্বাসী। এদের বলা হয় 'আল্ মুস্তামিন' অর্থাৎ 'আমান' বা পারস্পরিক নিরাপত্তায় যারা বিশ্বাসী। সে হিন্দু হতে পারে, খ্রিস্টানও হতে পারে আবার কোনো ধর্মাবলম্বী না হয়েও পরস্পর সহাবস্থানে বিশ্বাসী থাকতে পারে। এরা যে যার মত নিয়ে সমাজে অবস্থান করবে। অন্যের মতকে বাধা দেয়া যাবে না আবার সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান করলে তাকে সঙ্গও দেয়া যাবে না। অর্থাৎ একত্রে বাস করেও যে যার ধর্মচিন্তা নিয়েই থাকবে। একে বলা হয় 'মুস্তামিন'

বা 'মুআহিদ'। এখন এর দুই অবস্থা হয়। আবার এ রকমও হতে পারে, একে অন্যের সাথে একই সংগ্রামে শরিক হচ্ছে, যেমন মানবকল্যাণে মানবতার দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একজন হিন্দু, ইহুদি বা খ্রিস্টানও শামিল হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেও কিছু অধিকার পাবে। যেমন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের একটি বিষয় আছে (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩১)। কিন্তু সে যদি আবার বেতনভুক্ত সৈন্য হয় তাহলে তার আর এই অধিকার থাকে না। তখন তার কেবল বেতনের অধিকার থাকে। সে যদি সংগ্রামে শরিক হয় তাহলে সে তার সমান হয়ে যায়। আর যদি যৌথ সংগ্রামে শরিক না-ও হয় সে তার ধর্ম নিয়ে থাকতে পারবে, আর তার নিরাপত্তার ভার নিবে মুসলিম বাহিনী। তখন তার উপরে একটি নিরাপত্তা কর বসানো হয়। যেহেতু সে যুদ্ধে শরিক হচ্ছে না তাই নিরাপত্তা কর দিবে। এটাকে জিজিয়া বলা হয়ে থাকে।

জিজিয়া কী?

জিজিয়া শব্দের অর্থ প্রতিদান। অর্থাৎ নিরাপত্তাদানের প্রতিদানে নিরাপত্তা ব্যয়ে শরিক হওয়াকেই বলে জিজিয়া। এটি শুধু ধর্মের প্রশ্নে ছিল না। এই কর বৃদ্ধ এবং নাবালকদের উপরে প্রয়োগ হয় না। যারা নারী তাদের উপরেও প্রয়োগ হয় না, কারণ কোনো প্রতিদান ছাড়াই তাদের নিরাপত্তা প্রদান মুসলিম বাহিনীর উপরে কর্তব্য। এদের নিরাপত্তার ভার নেয়াটা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। আবার যারা তরুণ, বলবান বা যুদ্ধাভিজ্ঞ থাকে তাদেরকে ন্যায়ের যুদ্ধে শরিক হওয়ার আহ্বান জানানো হবে। ন্যায়ের জন্য তস্করদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান করা হবে। তাদের স্বাধীনতা আছে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার। তখন তাকে প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিদানস্বরূপ তার থেকে 'জাজা' নেওয়া হয়। আর এই প্রতিদানটাই হল 'জিজিয়া'। আরবী 'জিজিয়া'র উল্লেখ আছে কুরআন শরীফে। মুসলমানদের ব্যাপারে 'জিজিয়া'র কথা বলা হয়নি, কারণ মুসলমানের জন্য এটা ফরজ। সে যদি শক্তিমান এবং বলবান হয় তাহলে এটি আর তার ইচ্ছাধীন থাকে না। সত্য-ন্যায়ের সংগ্রামে শরিক হওয়াটা তার জন্য বাধ্যতামূলক। তাই মুসলমানদের প্রতিদান কর বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। আর ভিন্নধর্মের একজনের স্বাধীনতা আছে, তার ইচ্ছা হলে শরিক হতে পারে আবার ইচ্ছা না হলে শরিক নাও হতে পারে। শরিক হলে তাদের আর কর দিতে হবে না, আর শরিক না হলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর তাকে দিতেই হবে। আর তা খুব অল্পই নির্ধারিত হয়ে থাকে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানবাসীদের জন্য ১ দিরহাম জিজিয়া নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৬২৩)।

অমুসলিমদের উপর আক্রমণ কি ইসলাম সমর্থন করে?

ইসলামে পরিষ্কার বলা আছে যে শুধু অমুসলিম হওয়ার কারণে অন্যকে আঘাত করার অধিকার নেই। যারা আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা দিয়ে অমুসলিমদের উপর আক্রমণ করছে তারা কোনোভাবেই প্রকৃত ইসলামের অনুসারী নয়।

ইসলাম তো উদার, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক বিশ্বাস ও কর্মভিত্তিক এক জীবনব্যবস্থা। এখানে ধর্ম নিয়ে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি ও অসহিষ্ণুতার কোনো স্থান নেই। সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে–

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ □

তোমরা ধর্ম নিয়ে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করবে না।

সূরা মায়েদা, আয়াত ৭৭

ইসলাম মনুষ্যজাতি সৃষ্টির একক উপাদান ও বিন্দুর ঐক্যকে উল্লেখ করে সাম্প্রদায়িকতার মূলেই কুঠারাঘাত করেছে। সকল মানুষ একই বিন্দু আদম থেকে সৃষ্ট। সুতরাং এখানে বর্ণ, গোষ্ঠী, জাতি, ভাষা, লিঙ্গ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বিভেদ সৃষ্টির কোনো অবকাশ নেই। এগুলো নিয়ে বিভেদ সম্পূর্ণত মানুষের সৃষ্টি। তাই ইনসানিয়াতের নবী রসূল করীম (সা.) বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছেন, ইসলামে আসাবিয়াত ও সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। ফলে যেকোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামে পরিত্যাজ্য। এক হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية
وليس منا من مات على عصبية □

সাম্প্রদায়িকতার দিকে যে আহ্বান করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, সাম্প্রদায়িক চেতনায় যে যুদ্ধ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উপর যে মৃত্যুবরণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১২১

কাউকে ধর্ম পালনে বাধ্য করা কি জায়েজ?

না, জায়েজ না। তবে এই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। যিনি প্রথম থেকেই ইসলামকে স্বীকার করেন না তাকে ইসলাম ধর্ম পালনে বাধ্য করা যাবে না। কেউ যদি ইসলামকে স্বীকার করেন কিন্তু ইসলামের হুকুম মান্য না করেন তাদের সতর্ক করা বা শাস্তি প্রদানের বিধান ইসলামে রয়েছে। ইসলামের যে বা যারা সমাজ ব্যবস্থাপক ('কুযত্') থাকবেন তাদের বিবেচনা শক্তি ও অধিকার দেয়া হয়েছে যে তারা ইচ্ছা করলে ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পারে বা শাস্তি দিতে পারে। এতটুকুই শাস্তি হতে পারে যতটুকু দ্বারা সে সতর্ক হয়ে যায়। কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করার পরও মাদক ব্যবহার করে এর জন্য শাস্তি আছে। কিন্তু ভিন্নধর্মী কেউ যদি মদ খায় তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

ولا حد على الذمي في الشراب □

মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকের উপর মদপানের শাস্তি প্রয়োগ হবে না।।

ফতওয়ায়ে শামী, চতুর্থ খণ্ড
পরিচ্ছেদঃ নিষিদ্ধ পানীয় পানের শাস্তি

একজন মুসলমানের ক্ষেত্রে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ধরনের আরও বেশ কিছু নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। তবে এই নির্দেশনাগুলিও অনেক ক্ষেত্রে বিচারকের বিবেচনার উপরে নির্ভর করে।

অন্য ধর্মের উপাসনালয়ের উপর হামলা কি ইসলাম সমর্থন করে?

পূর্বেই বলেছি, অন্য ধর্মের মানুষদের রক্ষা করা যেমন মুসলমানের দায়িত্ব ঠিক একইভাবে অন্য ধর্মের উপাসনালয় রক্ষা করাটাও মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব যা জিহাদেরই অংশ। অর্থাৎ ধ্বংস তো করা যাবেই না, বরং রক্ষা করাটাই হচ্ছে অবশ্য কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ □

আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয় গির্জা, ইয়াহুদিদের উপাসনালয়, মন্দির অগ্নি উপাসকদের এবং মসজিদসমূহ যেখানে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান এবং পরাক্রমশালী।

সূরা হজ্জ, আয়াত ৪০

তবে যদি কোনো উগ্রবাদী দল বা গোষ্ঠী কোনো উপাসনালয়কে তাদের ঘাঁটি বানায় বা তাদের গোপন অস্ত্রভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহার করে তখন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াটা যুদ্ধের আইনে চলে যাবে।
একবার কিছু মুনাফিক একটি মসজিদ বানিয়েছিল যেটি আসলে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত। এই কর্মকাণ্ডকে জায়েজ করার লক্ষ্যে তারা রসূল (সা.)-কে ঐ মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাজে ইমামতি করার অনুরোধ করে। রসূল (সা.) তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন কিন্তু এ অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে দ্বিধায় পড়েন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাজিল করে ঐ মসজিদ ধ্বংস করার নির্দেশনা দেন। অর্থাৎ যে উপাসনালয় উপাসনার পরিবর্তে সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও মানুষের অনিষ্ট সাধনে ব্যবহৃত হয় তা ধ্বংস করার বিধান ইসলামে রয়েছে।
(তাফসীরে তবারী, চতুর্দশ খণ্ড)।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا
إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا □

আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং ইতঃপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে, তার গোপন ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই এটা করেছি। আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা মিথ্যাবাদী। আপনি কখনোই সেখানে নামায পড়বেন না।

সূরা তওবা, আয়াত ১০৭-১০৮

ভিন্নমত পোষণকারীকে হত্যা করলেই কি জান্নাত লাভ করা সম্ভব?

না, কখনোই না। কারণ ইসলাম তার মতবাদ পালনের ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করে না। বরং প্রত্যেককেই দুনিয়ার মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে মত গ্রহণ করার। কেউ ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌কে মানতেও পারে, ইচ্ছা করলে নাও মানতে পারে। ইচ্ছা করলে একজন ইসলাম কবুল বা গ্রহণ করতে পারে, ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। পৃথিবীতে এই মত বেছে নেয়ার স্বাধীনতা আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে দিয়েছেন। সুতরাং এই কারণে কাউকে কোনোরূপ আক্রমণ করার অধিকার ইসলামে নেই।

আর এতে জান্নাত লাভ করার প্রশ্নই ওঠে না। এক্ষেত্রে জান্নাতের যে মিথ্যা প্রলোভন দেখানো হয় সেটি একেবারেই ভুল। কেউ কোনো সৎ কাজের ভিত্তিতে জান্নাতের আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারে বা অসৎ কাজের ভিত্তিতে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে পারে, যা কোনো সমস্যা নয়। কুরআন শরীফের বহু আয়াতে আছে, এই এই কাজ যদি কেউ করে তাহলে সে জান্নাত লাভ করবে। তবে একজনকে কোনো বিষয়ে মিথ্যা প্রলুব্ধ করার কোনো অধিকার কারও নেই। কাউকে হত্যা করার জন্য অন্যায়ভাবে প্রলুব্ধ করা বা অপব্যাখ্যা দিয়ে প্রলুব্ধ করার কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। তাই অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে জান্নাত লাভ কখনোই সম্ভব নয়।

জান্নাতের প্রলোভন দেখিয়ে আইএস অনেক মধ্যবয়সী লোকদেরও প্রলুব্ধ করছে। তারা হয়ত ভালো চাকরি করত, ভালো বেতন পেত, পদমর্যাদাও ভালো ছিল। সাধারণভাবে মনে হয় এসব ছেড়ে দিয়ে জান্নাতলাভের উদ্দেশ্যেই তারা চলে গেছে। তবে মানুষের মন এত বেশি জটিল যে অনেক সময় নিজেও বুঝতে পারে না নিজে কী চাইছে। সবচাইতে দুর্জ্ঞেয় হল মানুষের কাছে তার মন। তাই এই সমস্ত বিষয়ে এত সরলীকরণ করা ঠিক নয়। কেবল প্রলুব্ধ হয়েই একজন বুদ্ধিমান, একজন জ্ঞানী মানুষ এ রকম নাও করতে পারে। বর্তমানে আমরা সন্ত্রাসকে যেভাবে ব্যাখ্যা করছি, পরিচয় দিচ্ছি, তার অনেকটিই 'সাত অন্ধের হস্তি দেখার' মতো। প্রত্যেক অন্ধই একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে হস্তিকে দেখেছে কিন্তু হস্তি কী জিনিস তা বের করতে পারেনি কেউ। সন্ত্রাস প্রবণতার পিছনে কেউ অর্থনৈতিক কারণের কথা বলছেন, কেউ হয়ত তার মানসিক সমস্যার কথা বলছেন, আবার কেউ ধর্মীয় কারণের কথা বলছেন। কেউ বেহেশতের লোভ বলছেন আবার কেউবা তার পারিবারিক সঙ্গহীনতার কথা বলছেন। বিষয়টির সরলীকরণ করা একেবারেই ঠিক হবে

না। এর পিছনে অনেক অনেক কারণ থাকতে পারে। হয়ত সে তার চাকরি জীবনে অসুখী ছিল, আহত ছিল। হয়ত সে শুনেছে আইএসে যোগ দিলেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আসে। এ রকম তো অনেকেই পেয়েছে। শুধু জান্নাতের লোভ না, সাথে প্রচুর অর্থের প্রলোভনও তারা দিয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের সুবাদে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অবাধ যৌনাচার ও নারীদের অপহরণ করে যৌনদাসী বিক্রয়ের উন্মুক্ত বাজার সৃষ্টি করেছে তারা, যা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত এবং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এসব জাগতিক প্রলোভনও বিভিন্ন উগ্রবাদী গোষ্ঠীতে যোগ দেয়ার পিছনে কাজ করে থাকতে পারে।

আবার হয়ত সামাজিক বৈষম্য বা কর্মক্ষেত্রে অবমূল্যায়নের শিকার হওয়ায় পদস্থদের উপরে ক্ষোভ মেটানোর জন্যও কেউ সেখানে যোগ দিতে পারে। এমনও হতে পারে, রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক জুলুমের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আইএসের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে ক্ষমতাধর হতে চায় সে। তাই শুধু জান্নাতের লোভই এর পিছনে কাজ করছে তা বলা যাবে না। অপরাধী যখন অপরাধবোধে অত্যন্ত দগ্ধ হয় তখন সে অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখে। এক অপরাধবোধ থেকে বাঁচার জন্য আরও হাজার অপরাধ করতেও সে দ্বিধা করে না।

বিদেশি এবং নাস্তিকদের হত্যা করা কি ইসলামে বৈধ?

একজন বিদেশি হল মেহমান এবং সে আমার এখানে 'আমান' বা নিরাপত্তা আশ্রয় নিয়ে এসেছে। সুতরাং তার উপরে কোনোরূপ আক্রমণ একজন মু'মিন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। যেখানে ইসলামের ইতিহাসে আশ্রিতের নিরাপত্তা রক্ষায় নিজের জান কুরবান করার একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে সেখানে এ ধরনের আক্রমণ সুস্পষ্টভাবে ইসলামবিরুদ্ধ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্যবার এ প্রসঙ্গগুলো ঘুরেফিরে এসেছে যে আল্লাহ্ পাক ফাসাদকারীকে পছন্দ করেন না, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা যাবে না, নারী ও শিশুকে হত্যা করা যাবে না, আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দিতে হবে, আশ্রিতের জান-মাল-সম্মান সর্বোচ্চ পবিত্র আমানত হিসেবে হেফাজত করতে হবে; সেক্ষেত্রে একটি মুসলিম সমাজে স্থায়ীভাবে হোক বা অস্থায়ীভাবে হোক, ভিনদেশি বা ভিন্নধর্মী যারা বসবাস করে তাদের সম্মান এবং সম্পদ রক্ষার জন্য একজন মুসলমানকে যদি প্রাণও দিতে হয় সেটা তাকে দিতে হবে। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে যে বিধান রয়েছে, নাস্তিকদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

ইসলাম ও ইসলামী গোষ্ঠীসমূহ

কুরআন কি সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে?

না, কখনোই না। সন্ত্রাস সম্পর্কে কুরআনে করীমে যেমন সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এর পাশাপাশি আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং জিহাদ সম্পর্কেও বলা হয়েছে। অনেকেই এই দুটি বিষয়ের পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেলেন। এই গুলিয়ে ফেলার দুটি দিক রয়েছে– একটি ব্যাখ্যাগত আর একটি হল প্রয়োগগত। এসব বিভ্রান্তির জন্য আজকাল অনেকেই সন্ত্রাসকে জিহাদ এবং জিহাদকেও সন্ত্রাস বলে ভেবে বসেন। কুরআনে করীমে এবং হাদীসে সুস্পষ্টভাবে সন্ত্রাস এবং জিহাদকে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সন্ত্রাস সম্পর্কে দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কুরআনে করীমে। একটি হল 'ফাসাদ', আর অন্যটি হল 'ফিতনা'। 'ফাসাদ' মৌলিকভাবে আরবী শব্দ। 'ফিতনা' শব্দটিও আরবী, তবে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এই দুটি শব্দই সন্ত্রাস অর্থে কুরআনে করীমে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ □

ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।
সূরা বাকারা, আয়াত ১৯১

সুতরাং এটি বলা যায়, হত্যার চেয়েও বড় পাপ হল সন্ত্রাস করা। অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন –

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ □

সন্ত্রাসী যারা তাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দই করেন না।

সূরা কাসাস, আয়াত ৭৭

সুতরাং কুরআনে করীমে বা হাদীসে এ ধরনের কোনো দূরবর্তী ইঙ্গিতও নেই যার দ্বারা একজন সন্ত্রাসী সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হতে পারে। ইসলাম কখনোই সন্ত্রাস সমর্থন করে না। অধিকন্তু সন্ত্রাস, হিংসা, হানাহানি নির্মূল করার জন্যই মহান ধর্ম ইসলামের আবির্ভাব। ইসলাম শান্তি ও ভালোবাসার ধর্ম। কুরআনে করীমে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ □

তিনি অধিপতি, চির পূতপবিত্র, শান্তি বিধাতা।
সূরা হাশর, আয়াত ২৩

আবার বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً □

হে ঈমানদারগণ, তোমরা শান্তির ধর্ম ইসলামে প্রবেশ কর।

সূরা বাকারা, আয়াত ২০৮

কুরআনে বর্ণিত আদেশ-উপদেশ কি নির্দেশনামূলক না বাধ্যতামূলক?

কিছু আছে বাধ্যতামূলক, কিছু আছে নির্দেশনামূলক, কিছু আছে উপদেশমূলক। আবার কিছু আছে নৈতিক বিধান, মানে নৈতিকতামূলক। বিভিন্ন ধরন আছে এই আদেশ, নির্দেশনা এবং উপদেশের। যেমন–

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ☐

নামায আদায় কর এবং যাকাত দাও

সূরা বাকারা, আয়াত ৪৩

এই নির্দেশ মুসলিমদের জন্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক।

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ☐

ইহ্‌রাম থেকে বের হওয়ার পর তোমরা শিকার কর।

সূরা মায়েদা, আয়াত ২

'শিকার কর' আদেশটি অনুমতিমূলক, অর্থাৎ এর অর্থ হল শিকার করতে পার।

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ☐

আর আপনার কাছে তারা জিজ্ঞেস করে যে, তারা কী ব্যয় করবে? বলুন, তোমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছু ব্যয় করে দাও।

সূরা বাকারা, আয়াত ২১৯

এই আদেশটি উপদেশমূলক।

এই বিষয়গুলো সম্যক বোঝার জন্য কুরআন, হাদীস এবং দ্বীন সম্পর্কে ব্যাপক, সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং অন্তরালোকসম্পন্ন হতে হবে।

কাফের কারা? কাদের কাফের বলা হবে?

কাফের শব্দটি এসেছে আরবী 'কাফারা' থেকে। এর অর্থ হচ্ছে লুকিয়ে রাখা, আচ্ছাদিত করা। ঠিক এ কারণেই আরবীতে কৃষককেও কাফের বলা হয়। কারণ সে বীজকে মাটিতে লুকিয়ে রাখে (লিসানুল আরব, ত্রয়োদশ খণ্ড, বর্ণ : কাফ)। পারিভাষিক অর্থে কাফের বলা হয় তাদেরকে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাকে প্রকাশ করে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্যকে প্রকাশ না করে লুকিয়ে রাখে। কাফের একটি পরিচয়মূলক শব্দ। পূর্বে একে গালি অর্থে ব্যবহার করা হত না। বৈদিক যুগে যারা আর্য ধর্ম মানত না তাদের যবন বলা হত। তখন এটি কোনো গালি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যবন শব্দটিকে মানুষ গালি হিসেবে ব্যবহার করে। বর্তমানে ঠিক একইভাবে কাফের শব্দটিও গালি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মৌলিকভাবে কাফের ছিল মুসলিম শব্দটির মতোই পরিচয়জ্ঞাপক। মুসলিম শব্দের অর্থ শান্তিবাদী এবং আনুগত্যশীল। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি যে অনুগত সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে লুকিয়ে রাখে না। সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের আনুগত্য থাকা জরুরি। কিন্তু একজন কাফের আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে লুকিয়ে রাখছে এবং এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে সে সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করছে। সুতরাং এটি প্রশংসনীয় নয়।

মুরতাদ বলা হয় কাদের?

আরবী 'রদ' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। 'রদ' মানে প্রত্যাখ্যান করা, ফিরে আসা বা রদ করে দেয়া। মুরতাদ হল আরবী 'ইরতাদ্দা' থেকে গঠিত একটি শব্দ। এর অর্থ হল ফিরে চলে যাওয়া। পারিভাষিকভাবে 'মুরতাদ' বলা হয় তাদের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু কোনো স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তারা ইসলাম থেকে ফিরে গেল।

কেউ ইসলামের মূলনীতির সাথে আর একমত না থাকলে বলা যেতে পারে ঐ ব্যক্তি তার প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, সরে গেছে। ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় হল সমস্ত মানুষই আল্লাহ্‌মুখী এবং তার জন্মই হয় ইসলামের উপরে। এটিকে 'ফিতরাত' বলা হয়েছে (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩১৯) – এর অর্থ ঐ ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যে আল্লাহ্‌কে মান্য করার একটি যোগ্যতা দিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বড় হওয়ার পরে সে আল্লাহ্‌কে মানবে কি মানবে না এই সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দেয়া হয় তাকে। যদি সে আল্লাহ্‌কে মান্য করে

তাহলে তার জন্য আখেরাতে সুবিধা প্রদান করা হবে। আর অমান্য করার অসুবিধাগুলোও তাকে জানানো হয়। এখন সে কোনটা গ্রহণ করবে এটা একান্তই তার সিদ্ধান্ত।

একজনকে মুরতাদ ঘোষণা করার এখতিয়ার কার আছে?

কোনো ব্যক্তিকে মুরতাদ ঘোষণা করার এখতিয়ার সবাই রাখে না। ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় একজন কাজীই শুধু পারেন কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করতে। একজন ব্যক্তি শুধু ইসলামে অনুষ্ঠিত রীতিনীতিগুলো মানছে না দেখে তাকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে দেয়া যাবে না। ঘোষণা দেয়ার জন্য অথরিটি লাগবে। কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করতে হলে সেই আর্জি ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় কাজীর নিকট পেশ করা হবে। কাজী তখন মুরতাদ হিসেবে যাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে তার সঙ্গে আলাপ করবেন। সেই ব্যক্তি যদি বলে যে সে ইসলামকে মানে না বা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে মানে না, সেক্ষেত্রে সে যদি পুরুষ হয় তাহলে তাকে বোঝাবার জন্য ইসলামী পণ্ডিতদেরকে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু যদি সে জিদ ধরে থাকে মানবেই না, তখন তাকে তিন দিনের মেয়াদ দেয়া হয় সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য (ফতওয়ায়ে শামী, চতুর্থ খণ্ড, পরিচ্ছেদ : মুরতাদ)। এরপর কাজী তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেটা তিনি বা স্বীকৃত অথরিটির পক্ষ থেকে যিনি বিচারক থাকবেন তিনি সিদ্ধান্ত নিবেন। আর ঐ ব্যক্তি যদি নারী হয় এবং সে যদি জিদও ধরে তবুও তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া যাবে না। তাকে বন্দি করে রাখা হবে যদি সে জিদ ধরে থাকে (আল বাহরুর রা'ইক, পঞ্চম খণ্ড পরিচ্ছেদ : মুরতাদদের বিধান)। সুতরাং মুরতাদ ঘোষণা করার এখতিয়ার রয়েছে শুধু ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় কাজীর বা ইসলাম সমর্থিত কর্তৃপক্ষের। একজন ইসলামী পণ্ডিত বা ইসলামী বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে পারবেন। তিনি শুধু মতামতই দিতে পারবেন কিন্তু সেটি কোনো স্বীকৃত ঘোষণা হবে না।

'মুশরিক' বলা হয় কাদের?

মৌলিকভাবে আল্লাহ্'র সত্তা বা তাঁর গুণাবলিতে আল্লাহ্'র সমতুল্য বলে যদি অন্য কোনো কিছুকে কেউ স্বীকার করে তাকে 'মুশরিক' বলা হয়। পরিভাষায় মুশরিক হল 'আশরাকা', মানে অংশী হিসেবে মেনে নেয়া। যেমন কেউ যদি বলে, সূর্য হল আল্লাহ্‌র সমান, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যেমন শক্তি সূর্যেরও

তেমনি শক্তি, কেউ এ ধরনের কথা বললে মুশরিক হয়ে যাবে। আবার যদি কেউ একথা মনে করে যে সূর্যের মহাশক্তি আছে কিন্তু সেটা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত তখন আর তাকে মুশরিক বলা যাবে না। অর্থাৎ যদি অন্য কিছুকে কেউ আল্লাহ্‌র সমতুল্য, আল্লাহ্‌র সত্তার মতো বা আল্লাহ্‌র সত্তার সমতুল্য গুণের অধিকারী দাবি করে তাহলে সে মুশরিক হয়ে যাবে।

কোনো মুসলিমকে কাফের ঘোষণা করার এখতিয়ার অন্য মুসলিমের আছে কি?

না, একজন মুসলিমকে কাফের ঘোষণা করার এখতিয়ার অন্য মুসলিমের নেই। পূর্বে যে ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, শুধু সেই মোতাবেকই কাউকে কাফের ঘোষণা করা যেতে পারে।

তাকফীরী কী?

'আসহাবুল হিজরা ওয়াত্ তাকফীর' একটি দল বা গোষ্ঠীর নাম। 'তাকফীর' শব্দটি এসেছে কাউকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়া বা কাফের বলা থেকে। মধ্যপ্রাচ্যে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' নামে একটি দল আছে। 'সৈয়দ কুতুব' প্রমুখ ছিল তাদের নেতা। এদের থেকে আলাদা হয়ে 'আসহাবুল হিজরা ওয়াত তাকফীর' নামে আরও চরমপন্থী একটি দল হিসেবে তারা আত্মপ্রকাশ করে। তারা এ কথা বলে আলাদা হয়ে যায় যে, "বর্তমান সমাজ অনৈসলামিক সমাজ, এই সামাজের সাথে বসবাস করা হারাম। তাই আমাদের জন্য হিজরত করাটা অবশ্য কর্তব্য, নাহলে আমরা আর মুসলমান থাকব না।" ইদানীং এ রকম বেশ কিছু উদাহরণ পত্র-পত্রিকাতেই দেখছি আমরা। দেখা যায়, ছয় মাস যাবৎ কেউ বাড়িতে নেই, কোথাও গিয়ে নিজেরা চার-পাঁচ জনে মেসে থেকে আলাদা একটি সমাজ বানাচ্ছে। অর্থাৎ তারা মনে করে তারা হিজরত করে ফেলছে। এই যে 'আসহাবুল হিজরা' অর্থাৎ যারা এই সমাজ থেকে হিজরত করাটাকে ফরজ মনে করে এরা এবং 'তাকফীরী'রা সমাজের অন্যদেরকে কাফের মনে করে। তারা মনে করে, কাফিরের সমাজে বসবাস করা যাবে না। কারণ এই সমাজে বসবাস করলে তারাও কাফের হয়ে যাবে। বিচ্ছিন্নভাবে এদের থেকেই উগ্রপন্থী ঐ দলটি বের হয়েছিল আইএস নামে। আইএসের মূল হল 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' বা 'মুসলিম ব্রাদারহুড'। আইএস এসেছে 'আসহাবুল হিজরা ওয়াত্ তাকফীর' থেকে আর 'আসহাবুল

হিজরা ওয়াত্ তাকফীর' এসেছে 'ইখওয়ান' তথা 'ব্রাদারহুড' থেকে। তাদের হিজরতের মতবাদের সাথে ইসলামের মূল ভাবধারার কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামে হিজরতের কথা বলা আছে। বলা হয়েছে, কেউ যদি এমন কোনো সমাজে থাকে যে সমাজে তার ইবাদত বাস্তবায়ন এবং আদায় করা অসম্ভব হয় এবং ইবাদত করার জন্য তার বিরুদ্ধে যদি শক্তি প্রয়োগ করে এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় তাহলে এ অবস্থায় সে এমন একটি অঞ্চলকে তালাশ করবে, যেখানে গিয়ে সে এই ইবাদতগুলো করতে পারে। এর ব্যতিরেকে হিজরত করার প্রয়োজন নেই, হুকুমও নেই। মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করা ছিল ফরজ।

সালাফী ও ওয়াহাবী কারা?

যারা বিজ্ঞজন এবং ইসলামের সৎ পণ্ডিত তাদের বলা হত আকাবির। আকাবির অর্থ হল ধর্মীয় দিক থেকে সর্বমান্য গুরুজন। এই আকাবির বা সর্বমান্য গুরুজনদের যারা মেনে চলত এবং এদের যারা অনুসরণ করত, মৌলিকভাবে তাদেরকেই সালাফী বলা হত। এর অর্থ অনেক ব্যাপক। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, একদল লোক এই নাম নিয়ে বিশৃঙ্খলা ছড়ানো শুরু করে। যারা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো শৃঙ্খলা মানতে চায় না বা নিজেরা যা বোঝে তাই অন্যদের উপর চাপাবার চেষ্টা করছে, এরাই বর্তমানে নিজেদেরকে সালাফী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। ঐরকম উগ্রবাদী কিছু গোষ্ঠী নিজেদেরকে সালাফী হিসেবে দাবি করে।

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নামে সৌদি আরবে একজন ইসলামী পণ্ডিত এবং আলেম ছিলেন। তিনি মৌলিকভাবে হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি ধর্মীয় বিষয়াবলি নিয়ে উগ্রপন্থা ধারণ করেন। তিনি নিজের মতো করে এক ধরনের মতবাদ দাঁড় করান। উনি বলেন, যে বা যারা উনার ঐ মতবাদকে অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাদের হত্যা করা জায়েজ। এই মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের অনুসারীরাই নিজেদের ওয়াহাবী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। বর্তমান সৌদির যে সরকার তাদেরও ধর্মগুরু ছিলেন তিনি। ওয়াহাবী মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের প্ররোচনায় তারা শেষ স্বীকৃত খিলাফতের প্রতিনিধি তুর্কি শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। মদীনা ও মক্কা শরীফে তারা আক্রমণ করে। পরবর্তীতে তারা ক্ষমতা দখল করে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই ওয়াহাবীরা উগ্রবাদী বলে পরিচিত।

কাফের হত্যা কি জায়েজ?

শুধু কুফরের কারণে কাউকে হত্যা করার বিধান ইসলামে নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার কারণে কাউকে হত্যা করা যাবে না। একজন কাফের যে আল্লাহ্‌কে মানে না তারও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার এবং নিজের ধর্মবিশ্বাসের উপর চলার অধিকার রয়েছে। ইসলাম তাকে সেই স্বাধীনতা দেয়। ইসলাম তাকে এতটাই স্বাধীনতা দেয় যে একজন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় এমন বিষয়গুলোও তার ক্ষেত্রে বৈধ বলা হয়েছে। যেমন, একজন মুসলমানের জন্য মদের ব্যবসা করা বা মদ তৈরি করা জায়েজ না। কিন্তু যারা অমুসলিম তাদের কাছে মদ নিষিদ্ধ জিনিস নয়। ইসলাম তাদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম সমাজে বসবাস করার পরেও মদের কারখানা করার অধিকার দেয়। আবার তাদেরকে রোজা না রাখার অধিকারও দেয় ইসলাম। রমজানের পবিত্রতার কথা বলে তাকে খেতে না দেয়ার কোনো কারণ নেই। শূকর পালন ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েজ নয় কিন্তু যাদের কাছে শূকর খাওয়া বৈধ তারা যদি পালন করে সেটাতে ইসলাম বাধা দেয় না।

কুফরির কারণে হত্যার কোনো নজির ইসলামে নেই। অতীতে এর কোনো প্রমাণ নেই যে শুধু কুফরির কারণে কাউকে হত্যা করা হয়েছে। অন্য কোনো অপরাধ বা আইন-শৃঙ্খলাজনিত কারণে বিচার ব্যবস্থার অধীনে হত্যার হুকুম হয়ত হতে পারে। তা-ও হবে স্বীকৃত কাজী বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

শহীদ কারা?

'শহীদ' একটি পারিভাষিক শব্দ, মৌলিকভাবে যার অর্থ হল সাক্ষ্য দেয়া। এটি এসেছে আরবী 'শাহাদত' শব্দ থেকে। এই আরবী শব্দের মানেই হল সাক্ষী দেয়া। কিন্তু এই শব্দটি ইসলামের একটি নিজস্ব পরিভাষা। শুধু আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য হতে হবে। এর আরও কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে। যখন জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন দেখতে হবে কী কী উদ্দেশ্যে জিহাদ করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার নামকে জাগরূক রাখার জন্য যেমন জিহাদ করা যেতে পারে, এর পাশাপাশি শোষিত মানুষকে রক্ষা করা, মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এমনকি মুসলিম সমাজে বসবাসরত বিধর্মীদের ধর্ম এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্যও যুদ্ধ বা জিহাদ করা যেতে পারে।

মুসলিম অধ্যুষিত সমাজে বসবাসরত অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়কে রক্ষা করার দায়িত্বও মুসলমানদের। এখন যদি সেটি রক্ষা করতে গিয়ে কোনো মুসলমান মারা যায় তাহলেও সে শহীদ হিসেবে গণ্য হতে পারে। এটি অনেক ব্যাপকতর একটি বিষয়। এক শব্দে বোঝাতে গেলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, সাধারণভাবে আমাদের এখানে বলা হয়, ইসলামের জন্য লড়াই করতে গিয়ে কেউ মারা গেলে তাকে শহীদ বলা হয়। পারিভাষিকভাবে লড়াইয়ের ময়দানে নিহত ব্যক্তিকেই শুধু শহীদ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেউ যদি যুদ্ধের ময়দান থেকে আহত হয়ে ফিরে এসে পরবর্তীতে মারা যায় তাহলেও সে পারিভাষিকভাবে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে না। (ফতওয়ায়ে শামী, তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ : শহীদ)

রাষ্ট্রের জন্য কেউ মারা গেলে তারা কি শহীদ হয়?

গণ্য হতে পারে। তবে এর পূর্বে একটি বিষয় দেখতে হবে, যে রাষ্ট্রের জন্য সে শহীদ হল সেই রাষ্ট্রটা জালিম ছিল কিনা। কাউকে শহীদ হিসেবে বিবেচনার ক্ষেত্রে লড়াইরত রাষ্ট্রের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্র যদি জালিম হয় তবে সেই রাষ্ট্রের জন্য প্রাণ দিলে কিন্তু শহীদ হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক লোক মারা গেছে এবং তাদের একটি বড় অংশ ইসলামের হেফাজত করবে ভেবে এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল; কিন্তু তারা শহীদের মর্যাদা পাবে না। কারণ এই যুদ্ধে বাংলাদেশ ছিল মজলুম। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবস্থান এই যুদ্ধে ছিল জালিমের। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যারা এই যুদ্ধে মজলুম অবস্থায় মারা গিয়েছেন তারা শহীদ হিসেবে গণ্য হতে পারেন। সুতরাং জুলুম থেকে বাঁচার জন্য যদি কোনো রাষ্ট্র যুদ্ধ করে আর সেই রাষ্ট্রের কোনো মানুষ যদি মারা যায় সে শহীদের মর্যাদা পাবে, যদি তার নিয়ত সহীহ থাকে।

শহীদরা কি নিঃশর্তে বেহেশতে যাবে?

শহীদরা বেহেশতে যাবে কিন্তু সেটি নিঃশর্তে না। কারণ হিসেবে প্রথমত বলা হয়েছে যে, সে যখন শহীদ হচ্ছিল তখন তার মনের নিয়ত কী ছিল তা জানতে হবে আগে। এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে অনেক শহীদকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। প্রশ্ন হতে পারে, কেন, সে তো আল্লাহর পথে

জীবন দিয়েছে? সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সে আল্লাহ্‌র পথে বা আল্লাহ্‌র নামে জীবন দেয়নি, সে জীবন দিয়েছে বীর হিসেবে খ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৮২)

একবার হযরত আলী (রা.)-এর সাথে একজনের যুদ্ধ হচ্ছে। হযরত আলী শারীরিক শক্তির দিক দিয়ে এবং বীর হিসেবে অত্যন্ত নামকরা ছিলেন। তার প্রতিপক্ষও খুব ভালো যোদ্ধা ছিল। প্রতিপক্ষকে কাবু করতে গিয়ে উনি গলদঘর্ম হয়ে গেলেন। খুব চেষ্টার পরে তাকে উনি কাবু করে নামিয়ে ফেললেন মাটিতে। যেই উনি হত্যার উদ্দেশ্যে তার বুকে সওয়ার হয়ে বসলেন সেই মুহূর্তে প্রতিপক্ষ ঐ লোক থুথু ছুড়ে মারল হযরত আলী (রা.)-কে। এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দিলেন। তখন প্রতিপক্ষ লোকটি অবাক হয়ে জানতে চাইল, কেন বাগে পাবার পরেও তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দিলেন তিনি। তিনি তখন বললেন, তুমি যে থুতু মারলে এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, তোমাকে যদি এখন আমি হত্যা করি এটা আমার এবং আমার প্রতিহিংসার কারণে হত্যা করা হবে। এটা আল্লাহ্‌র জন্য হবে না। আর আল্লাহ্‌র জন্য যদি না হয় তাহলে এটি আমার জন্য জায়েজ নেই। যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধরত অবস্থায় মানুষের কি অন্য কিছু চিন্তা করার অবকাশ থাকে? সেখানেও একজন মুসলমানকে শিখানো হয় তার নফ্‌সের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। কারণ এটি জিহাদে আকবর। এর মানে শহীদ হলেই কেউ নিশঃর্তে বেহেশতে চলে যাবে বিষয়টা এত সহজ নয়। স্পষ্ট বলা আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে সম্পর্কিত যে গুনাহগুলো আছে যেমন সে আল্লাহ্‌র নেয়ামত অস্বীকার করল বা সে ইবাদত করে নাই এ রকম বিষয়গুলোকেও মাফ করে দিবেন। কিন্তু বান্দার হক অর্থাৎ মানুষের যদি শহীদ ব্যক্তির উপরে কোনো হক থাকে যেমন সে কারও কাছ থেকে ঋণ করেছিল বা তার উপরে পাওনা ছিল তাহলে তাকে জবাব দিতে হবে। সে শহীদ হয়েছে বলে এগুলো মাফ হয়ে গেল তা নয়। ঐগুলি আদায় হতে হবে। না করলে হাশরের ময়দানে শেষ বিচারের দিনে তার জবাব দিতে হবে। এরপরে বেহেশতের প্রশ্ন।

খারেজী কারা?

খারেজী শব্দটি এসেছে 'আল খুরুজ' থেকে। সিফফিনের যুদ্ধ হয়েছিল হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর। হযরত মুআবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকে মানতে প্রস্তুত ছিলেন না।

তার কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। যে প্রশ্নগুলোর জবাব পেলে তিনি হযরত আলী (রা.)-কে মানতে প্রস্তুত ছিলেন। বড় প্রশ্ন ছিল এটাই যে, হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীরা হযরত আলী (রা.)-এর দলের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর দাবি ছিল যে, এদেরকে কারাগারে নেয়া হোক এবং আগের বিচার আগে করা হোক। আর হযরত আলী (রা.)-এর ভাষ্য ছিল যে, আগে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তারপরে বিচার। আগে সরকার প্রতিষ্ঠা হবে, তারপরে তিনি বিচার করবেন। তিনি মুআবিয়া (রা.)-কে বললেন, তুমি আগে আমাকে মেনে নাও, এর বিচার তো শরিয়ত অনুযায়ী হবেই। এই দ্বন্দ্ব নিয়েই পরবর্তীতে সিফফিনে যুদ্ধ শুরু হল। উভয় পক্ষই সন্ধির জন্য তৈরি ছিলেন। কারণ তারা পরস্পরকে সম্মান করতেন। যুদ্ধ খুব তীব্র চলছে। সকলেই বিপুল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার আশঙ্কা করছিলেন। মুআবিয়া (রা.) ভাবতে লাগলেন এই যুদ্ধ থামানোর উপায় কী। উপায় হিসেবে তাঁর পক্ষের লোকেরা বর্শার ফলায় কুরআন শরীফ টানিয়ে বলল যে, আমরা এই কুরআন শরীফের ফয়সালাই মেনে নিব, আমরা সন্ধি চাই। এই যুদ্ধে বাহ্যিকভাবে হযরত আলী (রা.)-এর বিজয়ের সম্ভাবনাই বেশি ছিল, তারপরও তিনি সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিলেন। সালিশ হিসেবে দুজন সাহাবীকে বেছে নিয়েছিলেন তারা দুজন। কেন হযরত আলী (রা.) সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিলেন? এই প্রশ্ন তুলে হযরত আলী (রা.)-এরই দলের কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-কে কাফের ঘোষণা করল। কুরআন শরীফের আয়াতের অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা বলল, "মান লাম ইয়াহকুম, বিমা আনযালাল্লাহ ফাউলাইকা হুমুল কাফেরুন"—অর্থাৎ "আল্লাহ্ যা নাজিল করেছেন এ অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা কাফের।" তারা বলা শুরু করল, আলী (রা.) কুরআনের বিধান থেকে সরে গিয়ে মানুষের বিধান মেনে নিয়েছেন। তারা বলল, হযরত মুআবিয়া (রা.) তো আগেই কাফের ছিলেন, এখন আলী (রা.)-ও কাফের হয়ে গেছেন। যেহেতু তারা হযরত আলী (রা.)-এর দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা দল গঠন করল, এ কারণে তাদের নাম হয়ে গেল 'খারেজী'। যদিও তারা নিজেদেরকে খারেজী বলত না। তারা নিজেদেরকে 'আসহাবুল আদ্‌ল' অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ বলত, 'আসহাবুল কুরআন' বলত। কিন্তু লোকমুখে 'খারেজী' নামটিই প্রচলিত হয়ে গেছে এবং এই নামেই তারা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।

এদের হাতেই কিন্তু হযরত আলী (রা.) শহীদ হন। তারা তিনজন লোককে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত করেছিল। তারা বলেছিল যে তিনজন লোককে না মারা পর্যন্ত ইসলাম বা মুসলমানদের শান্তি আসবে না। একজন হলেন হযরত আলী (রা.), একজন হলেন হযরত মুআবিয়া (রা.) আর আরেকজন

হলেন হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)। তিনজনকে তারা একসাথে একই পদ্ধতিতে আক্রমণ করে। এরা গুপ্তঘাতক হিসেবে সাংঘাতিক পারঙ্গম ছিল। এরাই বলেছিল, মুসলিম কেউ যদি কোনো গুনাহ করে, যেমন ইসলামে মদ খাওয়া হারাম, কেউ যদি মদ খায় তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু এটি ঠিক না, সাধারণ মুসলিম এই গুনাহ করার কারণে কাফের হয়ে যাবে না। তবে সে পাপী হবে, কাফের হবে না। এই দলের প্রভাব এখন আর মুসলিমদের মধ্যে তেমন একটি নেই।
এদের দর্শনটা– 'ফাকতুলুল মুশরিকীনা হাইসু ওয়াজাদতুমূহুম' মানে "মুশরিকদেরকে যুদ্ধের সময় যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা কর"– এই আয়াতের অপব্যাখ্যা দিয়েই দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে যারা উগ্রবাদী আছে তারাও এই আয়াতটির অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। খারেজীরা হত্যা করাটাকে বৈধ মনে করত। বর্তমানের এরাও হত্যাকে বৈধ মনে করে। এই আয়াতগুলির অপব্যাখ্যা দিয়েই তারা এইসব হত্যাকাণ্ডের বৈধতার সনদ খোঁজে। এই আয়াতগুলিকেই খারেজীরা ব্যবহার করত।

অথচ এই আয়াতটি ছিল বিশেষ এক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। কাফের হলেই যে একজন হত্যাযোগ্য হবে তা নয়। কিন্তু পূর্বে এ বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

খারেজীদের প্রভাব কি এখনও মুসলিমদের মধ্যে আছে?

না, এই নামে এদের প্রভাব এখন আর নেই মুসলিমদের উপর। এক অর্থে খারেজীরাই হচ্ছে ইসলামের প্রথম উগ্রবাদী গ্রুপ। সাধারণ মুসলিমরা কিন্তু তাদের ইসলামের ভিতরে শামিল মনে করে না। কারণ তারা ইসলামের মূল স্রোতের মধ্যে নেই, মূল ব্যাখ্যার মধ্যেও নেই।

খারেজীদের আবার ফান্ডামেন্টালিস্ট বা মৌলবাদী বলা ঠিক না, কারণ ফান্ডামেন্টালিজমের মূল সুর বুঝতে না পেরে অনেকেই একে একটি প্রশংসাসূচক শব্দ মনে করে ফেলে। আমাদের দেশে একটি বিরাট সংখ্যক আলেম, ইসলামিক চিন্তাবিদ এবং সাধারণ মানুষ এই কথাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে। তাই একে আসলে উগ্রবাদ বলতে হবে। এরাই ইসলামের প্রথম উগ্রবাদী গোষ্ঠী। তাদের সেই দর্শনগত পরম্পরা এখনকার আইএস বা 'জামায়াতে ইসলামী' এবং 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'রা বহন করে।

শিয়া বলা হয় কাদের?

শিয়া শব্দের অর্থ হল সাহায্যকারী। শিয়া শব্দটির মূল ছিল 'শিয়ানে আলী' মানে যারা হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ অবলম্বন করেছিল। শিয়ারা হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ অবলম্বনকে চরম অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। শিয়াদের কেউ কেউ এমনও বিশ্বাস করত যে আসলে নবী হওয়ার কথা ছিল হযরত আলী (রা.)-এর কিন্তু জিবরাইল (আ.) ভুল করে ফেলেছেন।

শিয়ারা কেন হযরত আলী (রা.)-কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে?

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের বিষয়ে সবাই একমত এবং ঐক্যবদ্ধ। এই বিষয়ে শিয়াদের সাথে অন্যদের মতভেদ হয়েছে। শিয়াদের দাবি ছিল, এটা ঠিক কাজ হয় নাই। শিয়াদের মতামত হল রসূল (সা.)-এর পরে হযরত আলী (রা.)-ই সবথেকে উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কারণ তিনি রসূল (সা.)-এর আত্মীয় হিসেবে সবচে নিকট এবং তাঁর জামাতা। তাই তাদের মতে, তখন খিলাফতের হকদার ছিলেন হযরত আলী (রা.)। তারা বলে, হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর হক থেকে বঞ্চিত করেছিলেন হযরত ওমর (রা.) আর হযরত আবু বকর (রা.) এই দুজন মিলে।

হযরত উসমান (রা.)-ও রসূল (সা.)-এর জামাতা ছিলেন। রসূল (সা.) -এর দুই কন্যা রুকাইয়া (রা.) আর উম্মে কুলসুম (রা.) এই দুজনেরই স্বামী ছিলেন তিনি। একজনের মৃত্যুর পর আরেকজনের বিয়ে হয় হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে। এরপর যখন উম্মে কুলসুমেরও মৃত্যু হল তখন রসূল (সা.) বলেছিলেন যে, আমার যদি আরও অবিবাহিত মেয়ে থাকত আমি উসমানের কাছেই তাকে বিয়ে দিতাম। যদি মেয়ের জামাতা হওয়ার কারণে খিলাফতের উত্তরাধিকারী বিবেচনা করা হয় তাহলে তো হযরত উসমান (রা.)-ই হযরত আলী (রা.)-এর থেকে বড় দাবিদার ছিলেন। মূলত ইসলামে এই ধরনের কোনো নীতি নেই।

তখন আরবে নেতা নির্বাচনে পরিবারতন্ত্রের পরিবর্তে খানিকটা গণতান্ত্রিক চর্চা ছিল। সর্দারের ছেলেই সর্দার হবে বা রাজার ছেলেই রাজা হবে এই বিষয়টি আরবে ছিল না। কেউ যোগ্য হলে সে-ই সর্দার বা বাদশা হবে এটিই ছিল নিয়ম। তাই সর্দারের সাথে তারা সাধারণ আচরণ করত। মানে তার

সমালোচনা করা বা তার সাথে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলা আরবে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন দিক থেকে লোকজন তখন ইসলামে এসেছে এবং এরা ছিল নয়া মুসলমান। এরা ইসলামের মূল সুর সম্পর্কে তখনও তেমন জানত না। রসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তারা তাদের দেখে আসা চিরাচরিত নিয়ম, হয় সন্তান না হয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ বাদশা বা সম্রাটের উত্তরাধিকারী হয়, সেই অনুযায়ীই ভেবেছে যে হযরত আলী (রা.)-ই রসূল (সা.)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কারণ হযরত আলী (রা.) ছিলেন রসূল (সা.)-এর আপন চাচাত ভাই। তাই হযরত আলী (রা.)-ই রসূল (সা.)-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন আত্মীয়তার দিক থেকে।

আবার আরেকটি বিষয় হল ইসলামে এক ধরনের উত্তরাধিকার পরম্পরা আছে। রসূল (সা.)-এর বড় দুই কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) এবং হযরত রুকাইয়া (রা.) রসূল (সা.) জীবিত থাকতেই মারা গেছেন। সুতরাং তাদের কোনো উত্তরাধিকার স্বত্ব আর থাকেনি, সেক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.)-এর দাবিও কমে যায়। যদিও প্রকৃত অর্থে নবীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেউ হয় না, তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি জনকল্যাণে ব্যবহৃত হয় (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪৬)। তবুও হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন রসূল (সা.)-এর একমাত্র জীবিত সন্তান। আর উনার স্বামী ছিলেন হযরত আলী (রা.)।

তাই হযরত আলী (রা.)-ই যে খিলাফতের হকদার এই ব্যাপারে 'আজমী' বা অনারব সমাজে প্রচলিত উক্ত ধারণাগুলোই শিয়াদেরকে প্রভাবিত করেছিল। তাই শিয়ারা আলী (রা.)-এর জন্য এরকম শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছিল।

শিয়া ও সুন্নীদের মৌলিক পার্থক্যগুলি কী?

বিশ্বাস ও আকিদাগত পার্থক্য যেমন তেমনি ব্যবহারিক আমল ইবাদতের ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান। শিয়াদের সবচে বড় ফেরকাটি হল 'ইসনা আশারিয়া'–তারা ইমামত আকিদার প্রবক্তা। অর্থাৎ তারা মনে করে, হযরত আলী (রা.), হযরত হাসান (রা.), হযরত হুসাইন (রা.) হয়ে বারজন ইমামের উপর ঈমান আনা মুসলিম হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক। শেষ ইমাম হলেন মাহদী যিনি জন্মের পর অদৃশ্য হয়ে আছেন, কিয়ামতের পূর্বে পুনঃআবির্ভাব ঘটবে। এই ইমামদের সকলেই নবীগণের মতো নিষ্পাপ। এদের মর্যাদাও নবীতুল্য।

'খোজা শিয়া'রা আরেকটি ফেরকা। এরা 'হুলূল' বা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আলীর এবং তৎপরবর্তী ইমামদের মাঝে প্রবিষ্ট এই বিশ্বাস রাখে। এই ধরনের বহু ফেরকা তাদের মাঝে রয়েছে। আলোচনার জন্য বিরাট পরিসরের প্রয়োজন।

মুরজিয়া কারা?

রাফেজী শিয়া গোষ্ঠীর একটি দল হল মুরজিয়া। মৌলিকভাবে এদের বিশ্বাস হল, কেবল ঈমান আনলেই মুসলিম হওয়া যাবে। তারা মনে করত, ভালো কাজেও কোনো লাভ নাই এবং খারাপ কাজেও কোনো দোষ নাই। অর্থাৎ খারাপ কাজ করলে শাস্তি পেতে হবে আবার ভালো কাজ করলে পুরস্কৃত হবে এমনটি ঠিক নয়। তারা মনে করত, কারও যদি ঈমান থাকে তাহলে সে যত খারাপ কাজই করুক সে বেহেশতে যাবে। অর্থাৎ তারা কর্মফলের ব্যাপারটিকে অস্বীকার করত।

'শিয়াদের' থেকে একটি দল বেরিয়ে এসে মুরজিয়া হয়। এই মতবাদ উমাইয়াদের সময়েই তৈরি হয়েছে। একদল সুন্নী মুরজিয়া আছে যারা বলে, খলীফাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর চেয়েও বেশি। হযরত আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) মর্যাদাশীল নন এ কথা কিন্তু তারা বলেনি কখনোই। মুরজিয়াদের মধ্যে যারা সুন্নী তারা বলে, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-ও অত্যন্ত মর্যাদাবান লোক, তবে আলী (রা.) হলেন সবথেকে মর্যাদাবান। সাধারণভাবে সুন্নীদের বিশ্বাস, হযরত আবু বকর (রা.) সবচেয়ে মর্যাদাবান আর এই ধরনের মুরজিয়াদের বিশ্বাস হল যে হযরত আলী (রা.)-ই সবথেকে মর্যাদাবান।

মুরজিয়াদের এই দর্শন কি মুসলমানদের উপরে এখনও প্রভাব বিস্তার করে?

বাংলাদেশে এই রকমের চিন্তার লোক নেই বললেই চলে। এর একটি বড় কারণ হল বাংলাদেশে মৌলিকভাবে শিয়াদের সংখ্যা অনেক কম এবং মাজহাবের ক্ষেত্রেও পার্থক্য খুব কম। এখানে হানাফীই বেশি। বাংলাদেশের মতো শান্তির দেশ পৃথিবীতে আর নেই। পাকিস্তানে তো নিয়মিতই মারামারি হয় এই দ্বন্দ্বগুলোর জন্য। সেখানে প্রত্যেকটি দলই আছে এবং এদের প্রায় সবাই শক্তিশালী, তাই বিভেদ এবং সংঘাতও অনেক বেশি।

সেই অর্থে মুরজিয়া নেই বাংলাদেশে বা এ রকম লোক থাকলেও এরা সংগঠিত নয়। কিন্তু এ রকম মনোভাবের প্রচুর লোক আছে যারা ভাবে যে তাদের শুধু ঈমান থাকলেই হবে। আমি মুসলমান মানেই সব ঠিক। কোনো পুণ্য কর্মে ভালো হওয়ার দরকার নেই। মুসলমান হলেই আমার জন্য যথেষ্ট। হাজারো পাপ করলেও আমার কিছু হবে না।

আহমদীয়া কারা?

ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস হল যে রসূল করীম (সা.)-এর পরে কোনো নবী আসবেন না। তিনি শেষ নবী (সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)। আহমদীয়ারা তা মানে না। সিপাহী বিদ্রোহের পরে এই অঞ্চলে মুসলমানদের উপরেই সবচেয়ে বেশি আঘাত নেমে আসে, কারণ ইংরেজরা বিশ্বাস করত যে এই বিদ্রোহ মুসলমানরাই করিয়েছে। যদিও এই বিদ্রোহে প্রচুর হিন্দুও শামিল ছিল এবং এটি কোনোভাবেই ধর্মভিত্তিক ছিল না। তারপরও ব্রিটিশরা মুসলমানদেরই লক্ষ্যবস্তু বানায় এবং তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চলতেই থাকে। এই সময়ে গোলাম আহমদ নামে একজন ব্যক্তি পাঞ্জাবের কোর্টে চাকরি করতেন। তিনি প্রচার করলেন, ব্রিটিশরাই মুসলমানদের জন্য এবং এই পৃথিবীর জন্য এখন সবথেকে ভালো এবং সকলের স্বার্থরক্ষার জন্যই জরুরি বিষয় হল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে এদেরকে মেনে নেয়া। এই মত তৈরির পিছনে ব্রিটিশদেরও একটি চক্রান্ত ছিল। ঐ ব্যক্তি আরও বললেন যে, এতদিন জিহাদ চলছিল। আমি নবী হয়ে আসছি এই জিহাদকে রহিত করে দেয়ার জন্য। ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো জিহাদ করা হবে গুনাহের শামিল।

সকল মুসলমানই বিশ্বাস করে যে, রসূল (সা.)-এর পরে আবার কোনো নবী আসছেন এ কথা কেউ যদি বিশ্বাস করে তাহলে সে আর ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। সে হিসেবে এ দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এবং আলেম-ওলামা আহমদীয়াদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। তবে আহমদীয়াদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী আছে যাদেরকে লাহুরী গোষ্ঠী বলা হয়, তারা এই কথা বলে যে, আমরা গোলাম আহমদকে নবী মানি না, আমরা তাকে সংস্কারক মানি। আহমদীয়াদের মধ্যে আবার দুটি গোষ্ঠী হয়ে গেছে। একটি হল 'রাবওয়াপন্থী', মূল নেতৃত্ব এদের হাতেই আর একটি হল লাহোর কেন্দ্রিক যাদেরকে 'লাহুরী কাদিয়ানী' বলে। গোলাম আহমদের

অনুসারীদেরকে আহমদীয়ার পাশাপাশি কাদিয়ানী বলেও ডাকা হয়। কাদিয়ান একটি গ্রাম এলাকার নাম। হিন্দুস্তানে ও পাকিস্তানে এটি একটি রেওয়াজ ছিল যে, কোনো একজন লোকের নামের সঙ্গে গ্রাম বা অঞ্চলের নামকে জড়িত করে ফেলা। কাদিয়ানী শব্দটি এ কারণেই গোলাম আহমদ নিজের নামের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। উনার মতবাদে বিশ্বাসীদেরকে তাই কাদিয়ানীও বলা হয়। অথচ কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে আবার 'আহমদীয়া' বলে। গোলাম আহমদ-এর 'আহমদ' নাম থেকেই তারা আহমদীয়া বলে নিজেদেরকে।

আহলে হাদীস কাদের বলা হয়?

'আহলে হাদীস' শব্দটির উদ্ভব এবং ব্যবহার ইসলামের প্রথম শতকেই ছিল। প্রথম যুগ থেকেই এটি ছিল এবং বর্তমানেও একদল লোক এই শব্দটিকে ব্যবহার করে। কিন্তু আগে যে অর্থে ব্যবহৃত হত বর্তমানে এ অর্থ হারিয়ে গেছে। আগে প্রত্যেকটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কিছু মনীষী তৈরি হতেন। যেমন ফিকাহ'র এবং মাসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যারা বিশেষজ্ঞ হতেন তাদেরকে 'ফকীহ্' বা 'আহলুল ফিকহি ওয়ার রায়' বলা হত এবং এদের মধ্যে যারা প্রাজ্ঞ হতেন এবং কুরআন-হাদীস থেকে যারা সমাধান বের করতে পারতেন তাদেরকে 'মুজতাহিদ' বলা হত। ঠিক এমনিভাবে হাদীসশাস্ত্রে যারা প্রাজ্ঞ হতেন এবং হাদীসশাস্ত্র চর্চায় যারা পারদর্শী হবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন তাদের বলা হত আহলে হাদীস। এদের মুহাদ্দিসও বলা হত, 'আহলে হাদীস' তথা যিনি হাদীসের সঙ্গে যুক্ত।

'আহল' শব্দটি অধিকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি যুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, পরিবার-পরিজন অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আরবীতে এই শব্দটি যখন কোনো শাস্ত্রের সঙ্গে বা কোনো একটি জ্ঞানবিষয়ক ব্যাপারের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় সেই জ্ঞানের অধিকারী।

বর্তমানে এই শব্দটির বড়ই সংকীর্ণ অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি দল আছে যারা মনে করে কোনো মুজতাহিদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করাটা শিরক। সরাসরি তারা কুরআন-হাদীস থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে চায়। তারা বলতে চায়, মুসলমানরা কেবল সহীহ হাদীসের উপরেই চলবে। অথচ তারা হাদীস সম্পর্কে জানে না। তারাও কিন্তু একজন আর একজনকে অনুসরণ করছে। কারণ তাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা আলেম না। হাদীস সম্পর্কে জানে

না। তারাও তাদের কোনো গুরুকে অনুসরণ করছে, তবু তারা নিজেদেরকে বর্তমানে একটি দল হিসেবে, একটি সংকীর্ণ দলীয় অর্থে 'আহলে হাদীস' শব্দটি ব্যবহার করে। যে শব্দটির উদ্ভব আমাদের উপমহাদেশে হয়েছিল ইংরেজ শাসনামলে। বিশেষত সিপাহী বিদ্রোহের পরে বা আশেপাশের সময়। বর্তমানে কেউ নিজেদের হানাফী হিসেবে পরিচয় দেয়, কেউবা শাফী হিসেবে পরিচয় দেয়। এই ধরনের একটি দল নিজেদের আহলে হাদীস হিসেবে দাবি করে আবার তাদেরকে অন্য পরিভাষায় 'গাইরে মুকাল্লিদ'ও বলা হয় যার অর্থ তারা কাউকে অনুসরণ করে না। 'গাইরে মুকাল্লিদ' সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের দেশে যারা আছে তাদের সংখ্যা খুব বেশি না। কিছু আছে রাজশাহী এবং জামালপুরের দিকে। কিছু আছে আমাদের ঢাকার আশেপাশে। খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে বর্তমানে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে। আর একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে যে এই 'গাইরে মুকাল্লিদ' বা আহলে হাদীসকে যারা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করছে, যেকোনো কারণেই হোক, এই শব্দটি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তাই দেখা যায়, যারা ওহাবী মতবাদের অনুসারী তারাই নিজেদেরকে বর্তমানে সালাফী হিসেবেও পরিচয় দিচ্ছে। সালাফী শব্দটির অর্থ আরও ব্যাপক ছিল। যেমন আহলে হাদীস শব্দটিও ব্যাপক অর্থে ছিল। একজন হানাফী সেও আহলে হাদীস। একজন শাফী, সেও আহলে হাদীস অর্থাৎ যে হাদীস চর্চা করে। ঠিক এমনিভাবেই সালাফী শব্দটিও ছিল ব্যাপক অর্থে।

এটি কোনো মাজহাব ছিল না। সিপাহী বিপ্লবের পরবর্তীতে মুসলমানদের মধ্যকার হতাশাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে এরাও একটি মাজহাব হিসেবে হাজির করেছে নিজেদের। রসিকতা করে অনেকেই একে 'মানি না'র মাজহাব বলে। তারা সবকিছুতেই 'মানি না' বলে অথচ তারাও তাদের কোনো এক নেতাকে ঠিকই মানে।

সালাফী বা তাকফীরীরা কেন অন্যদের মতবাদকে নাকচ করে দেয়?

এদের মৌলিক সূত্র এসেছে খারেজীদের কাছ থেকে। খারেজীরা অত্যন্ত উগ্রবাদী ছিল। তাদের কাছে তারা ছাড়া আর কেউ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তারা যা বুঝত তাকেই সত্য হিসেবে মানত। এর বিরুদ্ধে যারা যেত তাদের তারা সহ্য করতে পারত না। এই উগ্রতা এবং অসহিষ্ণুতা মানসিক

বৈকল্যের কারণে হয়। এরা তাই অন্য সকলের মতকেই খারিজ করার চেষ্টা করে সব সময়। অন্যের মতকে সম্মান দিতে পারার সহিষ্ণুতা এদের চরিত্রের ভিতরে একদমই নেই।

যে জ্ঞান মনের বিকাশ ঘটায় না, অন্তরের চক্ষুকে উন্মীলিত করে না সেই জ্ঞান যে কত ভয়ংকর, তা আমরা টের পাচ্ছি আমাদের সমাজে। বিদআত ও শিরকের বিরোধিতায় এই সালাফী এবং তাকফীরীরা একটি একচক্ষুবিশিষ্ট জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজের মধ্যে অশান্তি তৈরি করছে প্রতিনিয়ত। বিদআত ও শিরকের অপনোদন প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় কিন্তু উগ্রবাদিতা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আইন

মদীনা সনদ কী?

রসূল করীম (সা.) যখন মদীনা শরীফ হিজরত করে চলে আসেন, তখন মদীনায় যারা বাস করতেন তাদের অনেকেই ছিল মূর্তি পূজারী, মুশরিক এবং অনেকেই ছিল ইহুদি। ইহুদিদের কয়েকটি গোত্র ছিল। এর বাইরে কিছু ছিল খ্রিস্টান। রসূল (সা.) এসেই প্রথমে দুটো কাজ করলেন। প্রথমত, যারা মুহাজির হয়েছিলেন তাদের এবং আনসারদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সৃষ্টি করলেন (সীরাতে ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ : আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভাতৃত্ব স্থাপন)। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় 'মুআখাত'। এর মাধ্যমে মুহাজিরদের সর্বোৎকৃষ্টভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই ক্ষেত্রেও আমরা ত্যাগের এক বিরল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই তৎকালীন মুসলমানদের চরিত্রে। বর্তমানে অভিবাসন নিয়ে পৃথিবীব্যাপী যে অস্থিরতা তারই সুন্দর সমাধান হয়ে যেত যদি তারা ঐ ত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করত। পৃথিবীতে অভিবাসীদের কেউ গ্রহণ করতে চায় না। এ এক আশ্চর্য মানসিকতা। আমাদের মধ্যেও বিষয়গুলো আছে। খেয়াল করলেই দেখবেন, ট্রেনে বা বাসে উঠতে গেলে অন্যরা সবাই দুই হাত দিয়ে বাধা দেয়, উঠতে দেয় না। যখন একজন লোক হয়ত অনুরোধ করে বা জোর করে উঠে পড়ে এবং সামনের স্টেশনে আরেকজন যদি সেই গাড়িতে উঠতে চায় তখন আগের লোকটিই আবার বাধা দেয়। অধিকাংশ লোকের মানসিকতাই এখন এ রকম হয়ে গেছে। পুরনো অভিবাসীরা নয়া অভিবাসীদের শত্রু হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, রসূল (সা.) ইহুদি এবং মুশরিকদের নিয়ে একটি চুক্তি করলেন। এই চুক্তিটি ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এবং উদার একটি চুক্তি। এই চুক্তিটিকেই বলা হয় মদীনা সনদ। এই চুক্তির প্রধান কথা ছিল, মদীনায় যদি কখনও আক্রমণ হয় তাহলে সকল সম্প্রদায়ের লোক একসঙ্গে মদীনা রক্ষা করবে (সীরাতে ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ : ইহুদীদের সাথে রসূল (সা.)-এর মৈত্রীচুক্তি)। এ থেকেই বোঝা যায়, সেই রাষ্ট্রচিন্তা কতখানি অসাম্প্রদায়িক ছিল। সেই চুক্তিতে ছিল, প্রত্যেকেই তাদের ধর্ম নিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে পারবে। যদি বাইরে থেকে মদীনা আক্রমণ হয় তাহলে সব সম্প্রদায়ের লোক মদীনার শত্রুদের একযোগে প্রতিহত করবে। এই সনদের ভিত্তিতে মদীনার সকল অধিবাসী মিলে হল এক জাতি। মদীনা সনদের মূল ভিত্তিই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থানমূলক রাষ্ট্রচিন্তার।

আজও যদি রাষ্ট্রগুলি এই সহাবস্থানের নীতি মেনে চলতে পারত তাহলে তাদের মধ্যে পারস্পারিক কোনো দ্বন্দ্ব থাকত না। মানবাধিকারের কথা, কারও ধর্মীয় অধিকার বা ব্যক্তির অধিকারের কথাগুলিই ছিল এই সনদের ভিতরে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এত কাল আগে এত আধুনিক চিন্তা তিনি করেছিলেন যেটা আসলেই অসাধারণ। ভিন্ন ধর্মের মানুষদেরকেও তাদের পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কে শরিক করা হচ্ছে এই সনদের আওতায়।

শরিয়া আইন কী?

শরিয়া আইন হল মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ। একজন মুসলমানকে শরিয়তে যা করতে বলা হয়েছে এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এইগুলোর সমষ্টিই হল শরিয়া আইন।
যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এই আইন শুধু তার ওপরেই প্রযোজ্য। আর মুসলিম সমাজে বসবাসকারী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মীয় আইন বা তাদের নিজস্ব আইন অনুসারে চলবে। তবে বিবাদ মীমাংসার জন্য তারা সরকারপ্রধানের কাছে যেতে পারবে। সে সময়ে ইহুদিরাও রসূল (সা.)-এর কাছে আসত। রসূল (সা.) তাদেরকে তাদের ধর্মীয় পুস্তক অনুসারে কী ধরনের ফয়সালা হতে পারে তা ভেবে সেই অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫০)।

এর বাইরে ফৌজদারি আইন ছিল সকলের জন্য সমান।

শরিয়া আইনের উৎস কী?

শরিয়া আইনের প্রথম উৎস হল কুরআন এবং হাদীস। পরবর্তীতে এর সাথে যোগ হয়েছে ইজমা আর কিয়াস। এই চারটিকেই শরিয়া আইনের উৎস বলা হয়।

কে হাদীস ব্যাখ্যা করতে পারেন?

সাধারণ কথায় যিনি হাদীস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তিনিই হাদীস ব্যাখ্যা করতে পারেন। অর্থাৎ রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যার জ্ঞান আছে তিনিই হাদীস ব্যাখ্যা করতে পারবেন। রসূল (সা.)-এর কথা এবং কাজের বাইরেও তার জীবন সম্পর্কিত যতগুলি বিষয় আছে সবকিছুই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হাদীসও শরিয়তের একটি নির্দিষ্ট উৎস, কারণ রসূল করীম (সা.) হলেন কুরআনের ভাষ্যকার। তাই কুরআনকে বুঝতে হলে রসূল (সা.)-এর জীবনকেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝতে হবে এবং পর্যালোচনা করতে হবে, মান্য করতে হবে।

হাদীসের এই জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে স্বতন্ত্র একটি ধারারই উদ্ভব হয়েছে। যেহেতু সবাই রসূল (সা.)-এর সময় হাজির ছিল না, তাই তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য বর্ণনা পরম্পরা জানা জরুরি। এই বর্ণনা পরম্পরার ক্ষেত্রে 'আসমাউর রিজাল' নামে ইসলামের একটি নতুন জ্ঞানের পথ খুলেছে, একটি নতুন ধারা তৈরি হয়েছে। ধারাটিতে বর্ণনা পরম্পরায় যারা আছে তাদের জীবনীকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্ণনা পরম্পরায় যারা ছিল তারা কখনও মিথ্যা বলেছে কিনা, বা তারা কখনও কারও সাথে প্রতারণা করেছে কিনা, এ সকল ব্যাপারেও অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। আবার এদের ভিতরে কেউ কোনো দিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খেয়েছে কিনা, এটিও হিসেব করা হয়েছে, কারণ এটি সাধারণ সৌজন্যের পরিপন্থী। সৌজন্যের পরিপন্থী কাজ যে করেছে তার হাদীস বর্ণনাও গ্রহণ করা হয়নি।

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) একবার অনেক কষ্ট করে প্রায় হাজার মাইল সফর করে একজন ভদ্রমহিলার কাছে গেছেন তার কাছে রসূল করীম (সা.)-এর একটি হাদীস আছে শুনে। তিনি গিয়ে দেখেন, ভদ্রমহিলার স্বামী ঘরে নেই, বাজারে গেছে। তিনি যখন অপেক্ষা করছিলেন তখন ঘরের ভিতর থেকে একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। শিশুর কান্না থামাবার জন্য তার

মা তাকে বলছিল, তোমার বাবা বাজারে গেছে, তোমার জন্য এটা আনবে, সেটা আনবে। ভদ্রমহিলার স্বামী যখন বাজার থেকে ফিরে আসল, তার সাথে সৌজন্যমূলক আলাপের পরে ইমাম বুখারী (রহ.) জানতে চাইলেন, আপনার কি আজকে বাজার থেকে আপনার সন্তানের জন্য এই জিনিস আনার কথা ছিল? সে যখন না সূচক উত্তর দিল তৎক্ষণাৎ হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) সোজা রওনা হয়ে গেলেন ফিরতি পথে। তারা তখন তাঁর কাছে জানতে চাইল, তিনি কেন এসেছিলেন, আবার চলেই বা যাচ্ছেন কেন। তিনি বললেন, এসেছিলাম হাদীস সংগ্রহ করতে কিন্তু যে একটি সাধারণ শিশুর সাথে প্রতারণা করতে পারে সে যে রসূল (সা.)-এর হাদীসের ব্যাপারেও প্রতারণা করবে না তার নিশ্চয়তা নেই। এ থেকেই বোঝা যায় হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে কতখানি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এত সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে হয়ত অনেক সূত্র বেরিয়ে গেছে বা বাদ পড়ে গেছে কিন্তু কোনো মিথ্যা যেন না ঢোকে এই বিষয়ে তারা ছিলেন খুবই কঠোর। এইসব ছোটখাটো মনভোলানোর বিষয়গুলোকে আমরা খুবই তুচ্ছ এবং স্বাভাবিক মনে করি, প্রতারণা মনেই করি না, কিন্তু হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই দিকটিকেও দেখা হয়েছে খুব জোরালোভাবে।

যাহোক, হাদীস তারাই ব্যাখ্যা করতে পারেন যারা বর্ণনা পরম্পরার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। যারা হাদীস বর্ণনা করতে পারবেন তাঁদেরকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'সিকাহ ওয়া আদালত' অর্থাৎ তাঁকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে, যে জীবনে কখনও মিথ্যা বলেনি বা কখনও কারও সাথে প্রতারণা করেনি। সে সমাজের মধ্যে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। একই সাথে 'যবৃত ওয়া ইত্‌কান' অর্থাৎ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে সে হবে সর্বোচ্চ গুণের অধিকারী, স্মরণশক্তি এবং এর সাথে লেখনী শক্তি দুটোকেই এ ক্ষেত্রে খুব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ, দেখা গেছে, কেবল লেখনীর উপর নির্ভর করলে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়।

আজকের দিনে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদ অধিকারী হওয়ার সাথে কেবল আরেকটি শর্ত মানা হয়। শর্তটি হল, যে হাদীস বর্ণনা করবে সে ভালো চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী এবং মেধাবী হবে। কারণ হাদীসগুলো যা ছিল তার সবই ইতোমধ্যে সংকলিত হয়ে গেছে। এখন নতুন করে আর হাদীস খুঁজবার দরকার নেই। 'সিহাহ সিত্তা' বা এর বাইরেও অনেকগুলি হাদীসের গ্রন্থ আছে যেগুলোর উপরে নির্ভর করা যায়।

অবশ্য এই শর্তটি ধরা হলেই আমাদের দেশের অধিকাংশ হাদীস বর্ণনাকারীই মুহাদ্দিসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে। নিজেকে মুহাদ্দিস বলা সহজ বিষয় না। কেউ নিজেকে ডাক্তার দাবি করলেই যেমন সে ডাক্তার হয়ে যায় না এই বিষয়টিও সে রকম। এই হিসেবে ধরলে দেশে যত মুহাদ্দিস গজিয়ে উঠেছে এর শতকরা ৯০ ভাগই বাদ পড়ে যাবে।

সহীহ হাদীস কাকে বলা হয়?

রসূল (সা.) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সংকলিত হওয়া হাদীসগুলোর ভিতরে যেগুলোতে বর্ণনা পরম্পরায় এবং শব্দের মধ্যে কোথাও কোনোরূপ ভুল বা বিকৃত হয়নি সেগুলোকে সহীহ হাদীস বলা হয়। অর্থাৎ বর্ণনা পরম্পরায় যে সমস্ত লোক ছিলেন তাঁরা সবাই উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সিকাহ, ইতকান ও আদালতের সাথে সাথে যে শব্দগুলি বর্ণনা করেছেন, এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে তাঁরা কখনও ভুল করেননি। এ রকম একটি হাদীস হলেই সেই হাদীসটিকে সহীহ হাদীস বলা যাবে।

অনেক সময় শব্দ নকল করতে গিয়ে শব্দের পরিবর্তন হয়ে যায়। একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে গেলেই শব্দের পরিবর্তন ঘটে। অনেক হাদীসের ক্ষেত্রেই এ রকম ঘটেছে। কিন্তু সহীহ হাদীসে এ রকম কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইসলামে আকিদা এবং ফরজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে প্রমাণ করতে হলে খুব উচ্চপর্যায়ের সহীহ হাদীস হতে হয়। যে হাদীসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে তাকে 'যয়িফ' হাদীস বলে। যয়িফ মানেই সেটা গ্রহণযোগ্য না বিষয়টি কিন্তু সে রকম না। যে হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য না সেগুলোকে 'মওজূ' বলা হয়। তবে সহীহ বলা হয় সেগুলোকে যেটি সর্বোচ্চ মার্গের, 'যয়িফ' বলা হয় এর চাইতে একটু নিম্ন পর্যায়ের হাদীসকে আর 'মওজূ' বলা হয় যেগুলো একদমই অগ্রহণযোগ্য এবং মনগড়া।

দুই-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। কথায় আছে যে রসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য চীনে যাও। এটি কিন্তু হাদীস হিসেবে প্রমাণিত না। তবে কথাটি সত্য, কিন্তু কথা সত্য হলেই তা হাদীস হবে না। রসূল (সা.) হয়ত একভাবে বলেছেন, অন্যরা ভিন্নভাবে নকল করেছেন। এ রকম হলে তখন আর তা হাদীস থাকবে না। এটি সহীহ হাদীসেই বলা আছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান হল মুসলিমের হারানো ধন। তাই যেখানেই তা পাও

সেখান থেকে তা অর্জন কর (সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ২৭৮৭)। ঐ চীন শব্দটিকেই শুধু যুক্ত করা হয়েছে এখানে। কথাটা সত্য কিন্তু মূল হাদীসের সাথে চীন শব্দটি নেই।

মাজহাব কাকে বলে?

রসূল করীম (সা.)-এর সময় নতুন নতুন সমস্যা আসলে তার সমাধান খুব সহজ ছিল। রসূল (সা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কুরআন থেকে সমাধান দিতেন বা ওহী নাজিল হত। এভাবেই রসূল (সা.) সমাধান দিতেন। সাহাবা কেরামের সময়েও ততটা সমস্যা দেখা দেয়নি, কারণ তাদের অধিকাংশই রসূল (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি শুনেছেন এ বিষয়ে। অনেকেই সে সময়ে বিজ্ঞ ছিলেন হাদীসের বিষয়ে। পরবর্তীতে সাহাবীদের যুগ শেষ হয়ে যাবার পরে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে বিভিন্ন জায়গায়। সেই সূত্রে নানা জায়গায় নানা ধরনের সমস্যা হতে শুরু করে যা আরবের মধ্যে হয়ত কল্পনাও করা যায়নি। সিন্ধুতে এক ধরনের, মরক্কোতে এক ধরনের, ঐদিকে স্পেনে আবার আরেক ধরনের সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে। এই সমস্যাগুলো নিয়ে লোকেরা স্থানীয় বড় আলেমদের কাছে যেত। লোকেরা আসার কারণে তারা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস ঘেঁটে সমস্যার সামাধান দিতেন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খুব সুবিন্যস্ত এবং বিখ্যাত। যেমন ইমাম আবু হানিফাকে বড় ইমাম বলা হয় এই কারণে যে তাঁর বড় বড় আলেম নিয়ে চল্লিশ জনের একটি বোর্ড ছিল। যেকোনো সমস্যা আসলে তাঁরা সবাই মিলে আলোচনা করতেন, যার যার মত দিতেন এবং গবেষণা করতেন। পরে সবাই মিলে একটি সিদ্ধান্তে আসতেন এবং এই সিদ্ধান্তগুলোও লিখে রাখা হত।

বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয়ভাবে বড় আলেমরাই সকল সমস্যার সমাধান দিতেন। একপর্যায়ে সাধারণ মানুষরা ঐ আলেমদের অনুসরণ করা শুরু করল। অর্থাৎ তাদের মতামত অনুযায়ী সেখানকার সমাজকে তারা পরিচালনা করতেন। ঐ অনুসারেই আলেমদের কিছু অনুসারী তৈরি হয়ে যায়। এভাবেই মাজহাবের সৃষ্টি হয়।

এই মাজহাবগুলোর মধ্যে অনেকের দেয়া সমাধান সংরক্ষিত হয়ে আছে। আবার অনেকেরটাই সংরক্ষিত হয়নি। সবাই আবার সংরক্ষণের দিকে অতটা মনোযোগও দেননি। আবার কয়েকজন নিজেরাই সংরক্ষণ করেছেন, যেমন

ইমাম শাফী (রহ.) নিজেই কিতাব লিখে সংরক্ষণ করে গেছেন। একইভাবে ইমাম মালিক (রহ.) নিজে কিতাব লিখেছেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) নিজে কিতাব লিখেছেন। তাঁরা তাদের কিতাবে বিভিন্ন সমাধান এবং কিছু মূলনীতি দিয়েছেন। সমস্যাগুলোকে এই মূলনীতি অনুযায়ী সমাধান করার নিয়ম বাতলে গেছেন। যাদের এই বিধানগুলো লিখিত ছিল, অনুমিতভাবেই তাঁদের অনুসারী বেশি হয়েছে। আর যাদেরগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি তাঁদের প্রদত্ত সমাধান ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে।

ঘটনাচক্রে চারজন আলেমই বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন ইসলামী দুনিয়ায়। যেমন স্পেন আর মরক্কোর দিকে ইমাম মালিকের (রহ.) অনুসারী বেশি। সিরিয়া এবং আরবে মৌলিকভাবে ইমাম শাফীর (রহ.) অনুসারী বেশি। এদিকে ইরাক এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) অনুসারী বেশি ছিলেন। আর ইমাম আবু হানিফার (রহ.) অনুসারীরা সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে ছিলেন। এর কারণ তার সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র যিনি ছিলেন তিনি নিজেও অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের আলেম ও মুজতাহিদ ছিলেন এবং বাদশা হারুন-অর-রশীদের সময়ে তিনি সমস্ত মুসলিম জাহানের প্রধান বিচারপতি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল ইমাম 'আবু ইউসুফ' (রহ.)। তার কারণেই হানাফী মাজহাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের দেশেও বিভিন্ন সময়ে যেসব রাজন্যবর্গ বা আলেম-ওলামা এসেছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন হানাফী মাজহাবের অনুসারী। যার কারণে আমাদের এখানে হানাফী মাজহাবের অনুসারীর সংখ্যাই বেশি। অন্যান্য মাজহাবের অনুসারী এখানে একেবারেই কম। কেরালা এবং মুম্বাই-এর উপকূলে কিছু এলাকা আছে যেখানে শাফী মাজহাবের লোক দেখা যায়। এরা ইয়েমেন থেকে সরাসরি সমুদ্রপথে এসেছিল।

এই মাজহাবগুলির মধ্যে পার্থক্য কী?

তেমন কোনো পার্থক্য নেই। বিশেষ করে মৌলিক বিষয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। যেমন নামাজ ফরজ এটা সবাই বলেছেন, আবার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথাও সবাই বলছেন। আবার এটিও সবাই বলছেন, জোহরের নামাজ হল চার রাকাত আর মাগরিবের তিন রাকাত। আকিদা ও ফরজজাতীয় জিনিসগুলিতে মৌলিকভাবে কোনো পার্থক্য তৈরি হয়নি। পার্থক্য হয়েছে কিছু সুন্নত পালনের ক্ষেত্রে। যেমন নামাজের সময় হাত কবার উঠাতে হবে, কিভাবে হাত বাঁধতে হবে, নাকি হাত ছেড়ে রাখতে

হবে এই বিষয়গুলো নিয়েই পার্থক্য তৈরি হয়েছে। যেমন, ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, হাত ছেড়ে রাখাটা উত্তম। আবার ইমাম শাফী (রহ.) বলেন বুকে হাত বাঁধতে। আবু হানিফা (রহ.) বলেন, নাভির কাছে হাত বাঁধাটা উত্তম। পার্থক্য হল এখানেই। শুধু নামাজের ক্ষেত্রেই নয়, রোজা, হজ্জ, যাকাতের ক্ষেত্রেও কিছু পার্থক্য আছে। আবার যাকাতের পরিমাণ কী হবে সেটা নিয়ে কিন্তু কারও মতভেদ নেই। সুতরাং বলা যেতেই পারে, আকিদা ও ইসলামের ফরজ পালনের ক্ষেত্রে এই মাজহাবগুলোর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্যই নেই।

ইজমা ও কিয়াস কি এখনও প্রয়োগ হয়?

ব্যবহৃত হয় না কিন্তু হতে পারে। স্বীকৃত যে হাদীস আছে এদের কয়েকটি রূপ আছে। আগেই উদাহরণে বলা হয়েছে এ বিষয়ে। যেমন, নামাজ আদায় করতে গিয়ে হাত বাঁধার বিষয়টা কিন্তু ইজমা না। নামাজের সময় হাত নাভির নিচেও বাঁধা যায়, বুকেও বাঁধা যায়, আবার হাত ছেড়েও রাখা যায়। এখন এই যুগের আলেমরা একসাথে বসে যদি বলেন, এত ভিন্ন মতের দরকার নেই, সবাই বুকের মধ্যে হাত রেখে নামাজ পড়বে, তাহলে সেটাই ইজমা হবে। কুরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্তের বাইরের কিছু কিন্তু ইজমা হবে না। যেমন ইসলামে মদ খাওয়া, সুদ খাওয়া হারাম, এখন আলেমরা যদি একসাথে বসে বলেন, নাহ, এই যুগে মদ খাওয়ার দরকার আছে, সুদ ছাড়া তো চলবে না, তাহলে কিন্তু সেটা ইজমা হবে না। মৌলিক জিনিস পরিবর্তন করলে সেটা কখনোই ইজমা হবে না।

আবার কিয়াসের বিষয়টি একটু আলাদা। যেমন, কিছু বিষয় আছে যেগুলোর ব্যাখ্যা সরাসরি কুরআন থেকেও পাওয়া গেল না, আবার হাদীসেও পাওয়া গেল না এবং এ ব্যাপারে কোনো ইজমাও নেই। যেমন, আগে তো প্লেন ছিল না, রসূল (সা.)-এর জামানায় বা তাঁর পরের ইমামদের জামানায়ও ছিল না। এখন প্লেনের ভিতরে নামাজ পড়লে কি হবে, বা অদৌ পড়তে হবে কি হবে না এই বিষয়টিকে কুরআন, হাদীস এবং ইজমা অথবা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত অনুযায়ী ইসলামের মূলনীতির আলোকে সমাধান বের করাই হল কিয়াস। এখানে কিয়াসের ব্যাপারে আবার দুটি মত হয়ে গেছে। অনেকে বলছেন, সেজদা দিতে হলে মাটিতে দিতে হবে। আকাশ তো আর সেজদা দেয়ার জায়গা না। সুতরাং প্লেনে নামাজ পড়বেন না বা প্লেনে নামাজ পড়লেও সে নামাজ হবে না। প্লেন থেকে নামার পরে কাজা নামাজ পড়ে

নিতে হবে। তাদের যুক্তিটি হল, সেজদা হতে হবে 'আলাল আরদ'। 'আরদ' মানে হল মাটি। শোনা যায়, শিয়ারা এ কারণেই পকেটে মাটি রাখে সব সময়। টাইলসের উপরেও তারা সেজদা করে না।

আবার আরেক দল বলছেন, প্লেনেও নামাজ পড়তে হবে। তাদের কিয়াসের ধারণাটি হল, সমুদ্রের ভিতরে নৌকায় নামাজ পড়া যেহেতু জায়েজ আছে, তাই প্লেনেও নামাজ পড়া জায়েজ আছে। কারণ নৌকার নিচে থাকে পানি আর পানিরও নিচে থাকে মাটি। সেই হিসেবে প্লেনেও নামাজ পড়াটাকে তারা জায়েজ বলছেন।

কুরআন বা সহীহ হাদীসের একটি সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপরে নতুন কোনো একটি বিষয়ের সমাধান খোঁজাকেই কিয়াস বলা হয়।

ফতওয়া কী?

মৌলিকভাবে ফতওয়া অর্থ হল সমাধান দেয়া। কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান দেয়াকেই ফতওয়া বলে। একে রায় বা মতামতও বলা যেতে পারে। আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন যে, নামাজ কেমন করে পড়ব? বা জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো নারী ঋতুবতী অবস্থায় নামাজ পড়তে পারবে কিনা। আমি বললাম যে পারবে না, কারণ এটি কুরআন শরীফেই উল্লেখ আছে (সূরা বাকারা, আয়াত ২২২)। এই কথাটিই তখন ফতওয়া হয়ে যাবে। তখন কুরআন শরীফের কোন আয়াতে এই সম্পর্কিত আলোচনা আছে সেই রেফারেন্স দিতে হবে। ঠিক একইভাবে রেফারেন্সটা হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস থেকেও দেয়া যেতে পারে।

টিভিতে অনুষ্ঠান করে ইসলাম সম্পর্কে ফতওয়া দেয়া কি সমর্থনযোগ্য?

ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য যেমন একটি নির্দিষ্ট নির্ণায়ক আছে, একইভাবে ফতওয়া দেয়ার জন্যও একটি নির্দিষ্ট নির্ণায়ক আছে। যে কেউই ফতওয়া দিতে পারেন না। এর জন্য হাদীস এবং তাফসীর শাস্ত্রে বিজ্ঞ হতে হয়। এরপরে আবার ফতওয়া কিভাবে দিতে হয় এর জন্যও আলাদা ট্রেনিং করতে হয়। একে 'ইফতা' বলা হয়, যার থেকে এসেছে 'মুফতী'। 'দারুল ইফতায়' যখন কেউ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তখনই সে ফতওয়া দেয়ার

উপযুক্ত হয়। ফতওয়া বিষয়ে বহু কিতাব সংকলিত হয়েছে। কোনো কোনোটি তো ষাট-সত্তর ভলিয়ুম বিশিষ্ট। এগুলোর মধ্যে ফতওয়ায়ে শামী, ফতওয়ায়ে আলমগীরী খুবই প্রসিদ্ধ।

বিভিন্ন মাদরাসায় যেখানে দাওরায়ে হাদীস আছে সেখানে দাওরায়ে হাদীস পড়ানোর পরে দুই বছরের মুফতী হবার পড়াশুনা করায়। কোনো কোনো জায়গায় আবার এক বছর পড়ায়। এটি মৌলিকভাবে অনুশীলনের মতো। যেখান থেকে সনদপ্রাপ্তরা বর্তমানে 'মুফতী' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁরা স্ব স্ব মাজহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবের আলোকে ফতওয়া দিতে পারেন।

নারী

হিজাব কী ও কেন?

হিজাব আরবী শব্দ, এটি কুরআন শরীফেও ব্যবহৃত হয়েছে। হিজাবের শাব্দিক অর্থ হল আড়াল। বর্তমান সময়ে অনেকেই মাথায় যে রুমাল দেয় একেও হিজাব বলে, এই অর্থ হিজাবের মূল অর্থের উপর প্রযোজ্য নয়। কুরআন-হাদীসে যে হিজাবের কথা বলা হয়েছে তাতে মৌলিকভাবে বলা হয়েছে, পুরুষ এবং মহিলাদের জৈবিক গঠন অনুসারেই তাদের শালীনতার ভিতরে আসতে হবে। সাধারণত দেখা যায়, পুরুষের শালীনতার দিকটি ঠিকঠাক হয়েই যায়। কমপক্ষে সে যদি তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখে তাহলে তাই তার হিজাব, যা তার জন্য ফরজ।

নারীদের শারীরিক গঠনের কারণে তাদের হিজাব আরও অনেক বিস্তৃত। সে যদি ঘরের বাইরে যায় তাহলে তার হাত এবং পা ব্যতীত বাকি শরীরকে ঢিলেঢালা পোশাকে ঢেকে রাখবে। ঘরের বাইরে এটি মেনে চলা তার জন্য ফরজ, কিন্তু ঘরে সে কী পরল তা তার ব্যক্তিগত বিষয়। নারী-পুরুষের হিজাবের মধ্যে তারতম্য হয় তাদের শারীরিক গঠনের পার্থক্য অনুসারেই।

পর্দা আর হিজাব কি একই বিষয়?

মৌলিকভাবে প্রায় একই বিষয়। স্থানীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে হিজাবকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বানিয়ে ফেলা হয়েছে। যেমন ভারতে এবং ইরানে আর্যদের ভিতরে পর্দার বিষয়টি অত্যন্ত কঠোর ছিল। নারীদের আড়ালে রাখা বা অবরোধে রাখা ছিল আর্যদের সংস্কৃতি। আবার ইসলাম যখন ইরানে প্রবেশ করে, তারা তাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী চলাফেরার সুবিধার জন্য হিজাবকেই বোরখায় পরিবর্তন করে নিল। বোরখা হলে চলাফেরাও করা যায় আবার শরীরও ঢেকে রাখা যায়।

হিজাব করার জন্য বোরখা পরতেই হবে এমন বিষয় শরিয়তে নেই। এটি ঠিক যে বোরখা পরলে হিজাব করতে সুবিধা হয়। এখন আমাদের দেশের নারীরা যদি শাড়ি দিয়ে তার সম্পূর্ণ শরীর শরিয়ত মোতাবেক ঢেকে রাখতে পারে তাহলে এটিই তার জন্য হিজাব হয়ে যাবে, তার আর বোরখা পরার দরকার নেই। যেমন আমাদের এখানে গ্রামের নারীরা সাধারণত তার শাড়ি দিয়েই হিজাব করে যা আবার অন্যান্য অঞ্চলের নারীদের অভ্যাস নেই। তাই হয়ত ভারতীয় মৌলবী সাহেবরা শাড়ি পরাটাকে জায়েজ মনে করেন না। তারা মনে করেন যে শাড়ি পরলেও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বের হয়ে থাকে। ভারতে শাড়ি পরার ধরনের কারণে তারা এমন ভাবেন সম্ভবত। তারা যেভাবে শাড়ি পরে এতে তাদের শরীর অনেকখানিই অনাবৃত হয়ে যায়। আগে যেমন দেখা যেত হিন্দু বাড়ির মেয়েরাও, বিশেষ করে বিবাহিত মেয়েরা কখনোই মাথার কাপড় টেনে না দিয়ে বাড়ির বাইরে যেত না। এটিই হল পর্দা।

হিজাব কি বাধ্যতামূলক নাকি সংস্কৃতি এবং আবহাওয়াভেদে এর পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য?

হিজাবের রূপের পরিবর্তন হতে পারে তবে হিজাব করা বাধ্যতামূলক। হিজাব মানে শরীরকে আচ্ছাদিত করা। তবে সংস্কৃতি বা

আবহাওয়াভেদে এর রূপের পরিবর্তন ঘটতে পারে। শরিয়ত মোতাবেক একজন মহিলার পর্দা করা যেমন জরুরি, তেমনি তা একজন পুরুষের ক্ষেত্রেও জরুরি। শরিয়তে পুরুষকে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ◻

> ঈমানদার পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে।
>
> সূরা নূর, আয়াত ৩০

একইভাবে নারীদেরও তাদের দৃষ্টি আনত রাখতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ◻

> আর ঈমানদার নারীদের বলুন, তাঁরা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে।
>
> সূরা নূর, আয়াত ৩১

এটি হল চোখের পর্দা। মৌলিকভাবে পর্দার সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক হল চোখের সাথে। চোখকে কেউ যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে ধর্ষণ, নিপীড়নের মতো সমস্যাগুলো অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে।

আবার পুরো শরীর কাপড়ে আচ্ছাদিত করার পরও যদি তার শারীরিক গড়ন খুবই স্পষ্ট থাকে বা উন্মুক্ত থাকে তাহলে সেটিকে পর্দা বলা যাবে না।

ইসলামে নারীশিক্ষাকে কিভাবে দেখা হয়?

ইসলাম নর এবং নারী উভয়ের জন্য শিক্ষাকে ফরজ বলেছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ নর এবং নারী উভয়ের জন্যই ফরজ এটি হাদীসেই বলা হয়েছে। যতগুলি শিক্ষাসংক্রান্ত আয়াত নাজিল হয়েছে কুরআনে করীমে, কোথাও নারী এবং পুরুষের ভিতরে তারতম্য করা হয়নি। হয়ত কোনো জায়গায় নর বা নারীর উল্লেখ আছে আবার কোনো জায়গায় তা নেই। জ্ঞানীদের, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারীদের মর্যাদা উল্লেখ করে

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ □

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করে দিবেন।

সূরা মুজাদালা, আয়াত ১১

ঘরের বাইরে নারীদের কাজ করা বিষয়ে ইসলাম কী বলে?

নারীরা কাজ করতে পারবে না এ কথা ইসলামে সরাসরি কোথাও বলা হয়নি। রসূল (সা.)-এর সময়েও আরবে অনেক নারী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। এমনকি যিনি ইসলামে প্রথম বায়আত হয়েছেন সেই বিবি খাদিজাও (রা.) ব্যবসায়ী ছিলেন। এখনও আরবের গ্রামে বা আফ্রিকায় গেলে দেখা যায়, সেখানকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে নারীরা। আবার হজ্জের মধ্যে গিয়েও দেখা যায়, অনেক নারী বাজারের মধ্যে টুপিসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি করছে। ইসলামে কাজকে নিষেধ করা হয়নি। ইসলাম যেটা মৌলিকভাবে নিষেধ করেছে সেটি হল, কাজ করতে গিয়ে পুরুষের ততখানি সান্নিধ্যে আসা যাবে না যাতে চারিত্রিক অধঃপতনের শিকার হয়ে যাওয়ার শংকা থাকে। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইসলামসহ প্রত্যেক ধর্মেরই অন্যতম মৌলিক একটি বিষয়।

রাজনৈতিক বা পলিটিক্যাল ইসলাম কী?

এ ধরনের কোনো পরিভাষা ইসলামে নেই। এটি একটি নয়া সৃষ্টি এবং ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি করার জন্য এই শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, পলিটিক্যাল নামাজ বলতে কোনো নামাজ নেই, আবার ইসলামিক রোজা বলতে কোনো রোজা নেই। এটিই হল এদের দুরভিসন্ধি যে তারা ইসলামিক ব্যাংক, ইসলামিক বীমা এই শব্দগুলি প্রয়োগ করে। কিন্তু এই প্রয়োগ জায়েজ নয়, বৈধও নয়। তাই নামাজের ক্ষেত্রে ইসলামিক নামাজ বলে নামাজের পরিচয় হয় না, ইসলামী রোজা বলে রোজার পরিচয় হয় না আবার ইসলামী হজ্জ বলে হজ্জের পরিচয় হতে পারে না।

ইসলামে রাজনীতি সামগ্রিক ইসলামেরই একটি অংশ, এবং এই অংশটি মানুষের সামাজিক শৃঙ্খলা ও সামাজিক জীবন-আচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর কিছু মৌলিক বিধান ইসলাম দেয়। এই বিধানগুলোর মধ্যে প্রধান হল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে কিন্তু এই ধরনের ধর্মীয় কোনো নির্দেশনা নেই।

আবার পপুলার ইসলাম নামে আরেকটি কথাও শোনা যায় ইদানীং। ইসলামে এ ধরনেরও কোনো পরিভাষা নেই। কেউ কেউ নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণাকে প্রচার বা প্রকাশের জন্য পপুলার ইসলাম বলে এটিকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, আমি আমার মতো করে নামাজ, রোজা করব, ইসলামিক আচরণ করব এবং একই সাথে পাশ্চাত্যের রীতি অনুযায়ী মদ খাব, হালাল-হারাম নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই এ রকম। এটি তো খণ্ডিত ইসলাম। এক্ষেত্রে সে তার ইবাদত-বন্দেগির সোয়াব পাবে, কিন্তু সে যে গুনাহ করছে সেই গুনাহর জন্য পরিণামও তাকে ভোগ করতে হবে। একইভাবে তসবি জপতে জপতে কেউ ঘুষ খেলে তার ঘুষ খাওয়াটা জায়েজ হয়ে যায় না। পপুলার ইসলামেও এটা জায়েজ হয় না।

ফরায়েজী আন্দোলনই কি বাংলায় সালাফী মতবাদের সূচনা ঘটিয়েছিল?

না, এ রকম না। ফরায়েজী আন্দোলন যারা করেছিলেন তারা ছিলেন মাজহাবপন্থী। অন্যদিকে সালাফীরা কিন্তু মাজহাবপন্থী না। এদের ভিতরে বড় পার্থক্য এখানেই। ফরায়েজীরা পুরোপুরি হানাফী ছিলেন এবং এখনও আছেন। সুতরাং এদের প্রচলিত সালাফী বলা ঠিক হবে না। আর ফরায়েজী আন্দোলনের সাথে সালাফী যা ওয়াহাবীদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তখন এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে অনেকগুলো কুসংস্কার ঢুকে গিয়েছিল। তারা ফরজ বাদ দিয়ে নফল নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহ চিন্তা করলেন যে এ রকম নফল নিয়ে বেশি না ভেবে ফরজ নিয়ে আগে চিন্তা করা উচিত সবার। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর আন্দোলনের নাম ফরায়েজী আন্দোলন। এটি একটি সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন। এই আন্দোলনটিই পরবর্তীতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়।

এই আন্দোলন যখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয় তখনই বোঝা যায় এটি ওয়াহাবীদের চিন্তাধারার নয়। এই আন্দোলন ছিল দেশের মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির আন্দোলন। সে সময়ে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত নিগৃহীত ছিল। ঐ নিপীড়িত, নিগৃহীত মানুষের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ'র ছেলে দুদু মিঞা।

সালাফীদের বা ওয়াহাবীদের সমাজ সংস্কারের চিন্তা ছিল না এবং তারা ধর্মের মধ্যকার বিষয়গুলোকে নিয়ে বেশি গোঁড়ামি করত। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি বা বাড়াবাড়ি ইসলাম চায় না। ইসলাম সকল ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি অপছন্দ করে, এবং ইসলাম নিজেই একটি মধ্যমপন্থা হিসেবে দাবি করছে নিজেকে। আল্লাহ্ কুরআন শরীফে বলেছেন যে, তোমরা হলে এমন একটি দল যারা মধ্যমপন্থী । না ডান দিকে না বাম দিকে।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا □

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৩

ধর্মের নামে বাড়াবাড়ির কোনো অনুমতি ইসলাম দেয় না। কুরআনে করীমে উল্লেখ হয়েছে–

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ □

তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না।

সূরা নিসা, আয়াত ১৭১

আরও ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ □

তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।

সূরা হজ্জ, আয়াত ৭৮

তাবলীগ জামায়াত কী?

এটিও একটি সংস্কার আন্দোলন। মেওয়াত নামে দিল্লির কাছেই একটি এলাকা ছিল যেটি এখন হরিয়ানায় পড়েছে। এক সময়ে এ এলাকার বাসিন্দারা খুবই পশ্চাৎপদ ছিল। তারা নিজেদের মুসলমান বলত কিন্তু ইসলামের কোনো আচার-অনুষ্ঠান পালন করত না। তাদের মধ্যেই প্রথম মৌলিকভাবে এ আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলে দেয়। যারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁরা 'দারুল উলূম দেওবন্দের'ই সন্তান ছিলেন, অর্থাৎ দেওবন্দ থেকেই তাঁরা পড়াশুনা করেছেন। তাই এই আন্দোলনকে দেওবন্দ আন্দোলনের সাথেও সম্পৃক্ত করা হয়।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে দেওবন্দ এবং তাবলীগ জামায়াতের মতপার্থক্য কী নিয়ে?

এদের মধ্যে মতপার্থক্য অনেক বেশি। জামায়াতে ইসলামী উগ্রবাদী মতবাদে বিশ্বাসী। জামায়াতে ইসলামীর এই মতবাদের সাথে সম্পর্ক আছে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীনের' বা 'মুসলিম ব্রাদারহুডের'। জামায়াতে ইসলামীর সাথে তাদের সরাসরি সম্পর্কও ছিল। এরা ইসলামের উগ্রবাদী ব্যাখ্যা দেয়। মওদুদী ও সৈয়দ কুতুব পরস্পরের বন্ধু ছিলেন এবং তারা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন।

এদের মৌলিক পার্থক্যই তৈরি হয় এই উগ্রবাদী চিন্তাধারার কারণে। ঠিক একইভাবে আকিদাগত কিছু পার্থক্য আছে এদের ভিতরে। যেমন রসূল (সা.) এবং সাহাবা কেরামদেরকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করেন দেওবন্দীরা। আর জামায়াতে ইসলামীপন্থীরা বলে, তাঁরাও অন্যদের মতোই সাধারণ মানুষ, সুতরাং তারা তাঁদের সমালোচনা করে এবং তাঁদের ভুলগুলোকে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। আবার দেওবন্দীরা এটা মনে করেন যে রসূল (সা.)-এর মৃত্যু অন্যান্য মানুষের মতো সাধারণ মৃত্যু নয়। তাঁরা মনে করেন, তিনি কবরে জীবিত অবস্থায় আছেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীরা বলে যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি শেষ হয়ে গেছেন।

তবে এদের মূল পার্থক্য হচ্ছে উগ্রবাদিতা প্রসঙ্গে। দেওবন্দ এবং তাবলীগ হল মধ্যমপন্থী, শান্তিবাদী। আর জামায়াতে ইসলামী বলে যে, ইসলামের মূল

লক্ষ্যই হল ক্ষমতা ও সরকার গঠন করা, তা যেকোনোভাবেই হোক। ক্ষমতা ও সরকার গঠনের মাধ্যমে তারা ইসলাম কায়েম করতে চায়। আর দেওবন্দ এবং তাবলীগ বলে, দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কুরআন কি কেবল আরবী ভাষাতেই পড়া বাধ্যতামূলক? নাকি নিজের ভাষায় কুরআন পড়ে সেখান থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারবে মুসলিমরা?

দুটো বিষয় আছে এখানে। একটি হল কুরআন তেলাওয়াত আর অন্যটি হল কুরআন-এর উপর আমল করা, অর্থাৎ কুরআন অনুসারে নিজেকে গঠন করা।

আরবী না জানলে তো কুরআন তেলাওয়াতই করা যাবে না। যেমন, বাংলা না জানলে বাংলা সাহিত্য কেউ পড়তে পারবে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুরআন তেলাওয়াত বাধ্যতামূলক, যেমন নামাজের মধ্যে। এতটুকুর জন্য একজনের আরবী জানা জরুরি না কিন্তু মুখস্থ থাকাটা জরুরি। যেমন, কমপক্ষে তিন আয়াত পরিমাণ আর সূরায়ে ফাতেহা জানা একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। আর বাকি কুরআনে করীম সে যদি বাংলায় বা অন্য কোনো ভাষাতেও বুঝে পড়ে তাহলেই তা তার আমলের জন্য যথেষ্ট হবে। তবে এর জন্য সে কুরআন তেলাওয়াতের কোনো সোয়াব পাবে না। কারণ কুরআনের সাথে শুধু ভাষার সম্পর্ক না, একজন মুসলমানের বিশ্বাস হিসেবে, আল্লাহ্‌র কালাম হিসেবে কুরআনের সম্পর্ক। আল্লাহ্‌র কালাম তর্জমা হয় না। রসূল করীম (সা.)-এর ওপরে দুই ধরনের ওহী নাজিল হয়েছে। এক ধরনের ওহীতে কেবল মর্ম নাজিল হয়েছে যা রসূল (সা.) নিজের শব্দে, নিজের ভাষায় প্রকাশ করছেন। এখানে শব্দের নির্বাচন ছিল রসূল (সা.)-এর আর ভাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর অন্য ধরনের ওহী নাজিল হয়েছিল ভাব ও ভাষাসহ। এটিই কুরআন শরীফ। তাই একে বলা হয় আল্লাহ্‌র কালাম।

যার কেবল ভাব নাজিল হয়েছিল আর রসূল (সা.) নিজের ভাষায় তাকে প্রকাশ করেছেন তাকে বলা হয় হাদীস। বলে রাখা ভালো যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আরবের মানুষ ছিলেন, তাই কুরআন শরীফ আরবী ভাষায় নাজিল হয়েছে। তিনি অন্য কোনো স্থানের বাসিন্দা হলে

হয়ত সে ভাষাতেই কুরআন নাজিল হত। আমরা তো স্বীকার করি ইহুদিদের উপরে আল্লাহ্‌র কালাম বা আল্লাহ্‌র ওহী নাজিল হয়েছে। এটি তো আরবীতে হয়নি, হয়েছে হিব্রুতে। কোনো কোনো নবী সেমেটিক ছিলেন, তাই সাম বা সেমেটিক ভাষায়ও ওহী নাজিল হয়েছে। রসূল (সা.)-এর আগে বহু নবী এসেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, আমি এমন কোনো জনপদ রাখিনি যেখানে আমি আমার কোনো প্রতিনিধি অথবা নবী পাঠাইনি। আবার অনেকের ক্ষেত্রেই ধোঁয়াশা আছে তিনিই নবী কিনা সেই বিষয়ে। যেমন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, কুরআন শরীফে 'যুল কিফল' নামে একজন নবীর কথা উল্লেখ আছে যিনি কিফলের অধিবাসী। তিনি বলেছেন যে কিফল ছিল কপিলাবস্তুর অপভ্রংশ। সে হিসেবেই তিনি বলেছেন যে গৌতম বুদ্ধও নবী হতে পারেন। আমরাও বলি, হতে পারেন কিন্তু তিনিই নবী ছিলেন এই কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যাচ্ছে না।

ইসলাম সম্পর্কে টিভি বক্তা জাকির নায়েকের মতামত বা ব্যাখ্যা কি গ্রহণযোগ্য?

একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ইসলাম সম্পর্কে মতামত দেয়ার কোনো যোগ্যতা রাখেন না এবং এ কারণেই তার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি একজন ডাক্তার মাত্র। এবং তার পড়াশোনা তা নিয়েই। তিনি ইসলাম সম্পর্কে মতামত দেয়ার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কোনোরূপ অথরিটি গ্রহণ করেন নাই। নিজের পড়াশুনা থেকে যা বুঝেছেন তাই বলতে থাকেন। তার নিজের বোধ অনেক সময় কুরআন–হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য রাখে আবার অনেক সময়ই সামঞ্জস্য রাখে না। তিনি একজন ধীমান ব্যক্তি, দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। সেখানেই তাঁর সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তাঁর ফিক্‌হী মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর সম্পর্কে উগ্রবাদিতার অভিযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন আবাসিক মাদরাসাকে ভিত্তি করে জঙ্গিবাদের উত্থানের যে প্রবণতা লক্ষণীয় তা কিভাবে বন্ধ করা যেতে পারে?

মৌলিকভাবে মাদরাসাগুলো জঙ্গিবাদের উত্থানের কেন্দ্র এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই। জঙ্গিবাদ জিনিসটা আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে ইসলামের উগ্রবাদী ব্যাখ্যা থেকে। আর এই উগ্রবাদী ব্যাখ্যার ধারক-বাহক হচ্ছে জামায়াত এবং শিবির। তাই যেসব মাদরাসায় জামায়াত-শিবিরের প্রভাব আছে ঐসব মাদরাসাতেই জঙ্গিবাদের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। আর যেখানে তাদের প্রভাব নেই সেখানে জঙ্গিবাদেরও কোনো ভিত্তি নেই। তাই মাদরাসার কারণে নয়, ইসলামের উগ্রবাদী অপব্যাখ্যার কারণে এখানে জঙ্গিবাদের প্রভাব বেড়েছে।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ রুখতে ইজমা ও কিয়াসকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে?

কিয়াসের ব্যবহার সেখানে প্রয়োজন যেখানে কোনো সহীহ হাদীস বা কুরআনের ব্যাখ্যা নেই। জঙ্গিবাদের বিষয়টি এতটাই স্পষ্ট যে, সরাসরি কুরআনে আয়াত আছে– এ ধরনের সন্ত্রাস হারাম। বিভিন্ন হাদীসের মধ্যেও এই ধরনের সন্ত্রাসকে হারাম বলা হয়েছে।
কুরআনে করীমে পরিষ্কার বলা হয়েছে–

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ☐

তোমরা পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর না, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলাকারীদের পছন্দ করেন না।

সূরা কাসাস, আয়াত ৭৭

সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র লানত বা অভিসম্পাত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ .
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ □

ক্ষমতায় গেলে হয়ত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এরা তারাই যাদেরকে আল্লাহ্ লানত করেন আর দৃষ্টিশক্তিহীন ও বধির করেন।

সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ২২-২৩

সন্ত্রাস সৃষ্টি কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا □

পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে সন্ত্রাস ও বিপর্যয় সৃষ্টি কর না।

সূরা আরাফ, আয়াত ৫৬

সন্ত্রাস এবং বিশৃঙ্খলাকারীদের আশ্রয় দেয়া, কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করা হারাম এবং লানতযোগ্য অপরাধ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لعن الله من آوى محدثا □

আল্লাহ্‌র লানত পড়ুক তাদের উপর যারা বিশৃঙ্খলাকারী-পাপাচারীদের সাহায্য-সহযোগিতা করে।

সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৮

ফকীহগণ বলেছেন, এই হাদীসে উল্লিখিত 'মুহদিস' শব্দটিতে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরাও অন্তর্ভুক্ত।

সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ☐

আর তোমরা বাড়াবাড়িকারীদের নির্দেশ অনুসরণ করবে না। যারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।

সূরা শু'আরা, আয়াত ১৫১-১৫২

কোনো মানুষকে, কোনো মুসলমানকে ভয় প্রদর্শন করা ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ☐

কোনো মুসলমানের জন্য অপর কোনো মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করা জায়েজ নেই।

আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৫৩

অপর এক হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وان كان أخاه لأبيه وأمه ☐

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র তাক করে, ফেরেশতাগণ তাকে লানত দিতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা নামিয়ে রাখে, যদিও সে তার আপন ভাই হয়।

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬১৬

আরেক বর্ণনায় এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> من نظر إلى أخيه المسلم نظرة يخيفه بها أخافه الله يوم القيامة □
>
> যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকায় যা তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করবেন।
>
> মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৮৯৭৪

ইসলাম একটি মানুষের প্রাণরক্ষাকে এত বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয় যে, কুরআনে করীমে স্পষ্ট বলা হয়েছে–

> مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا □
>
> একটি মানুষকে হত্যা গোটা মনুষ্য জাতিকে হত্যার নামান্তর এবং একটি মানুষের প্রাণরক্ষা গোটা মনুষ্য জাতির প্রাণরক্ষার নামান্তর।
>
> সূরা মায়েদা, আয়াত ৩২

নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা, শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অসহায়– এদের হত্যা করা যুদ্ধাবস্থায়ও ইসলামে জায়েজ নেই। এক জিহাদে কোনো এক নারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৫২)

কিয়াস চতুর্থ স্তরের বিষয়। এই বিষয়টি রুখবার জন্য তো আরও কঠোর হুকুম রয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কী?

মৌলিকভাবে মাদরাসা শব্দটি অত্যন্ত উদার এবং খুবই সাধারণ একটি শব্দ। 'দারস্' মানে হল পাঠদান। আরবীতে শব্দের আগে সাধারণত 'মীম' অক্ষরটির ব্যবহার হয় সময় বা জায়গা বোঝানোর জন্য। একে বলা হয় 'জারফ'। দারস্ শব্দের সঙ্গে যখন 'মা' বা 'মীম' ব্যবহৃত হচ্ছে, এর অর্থ দাঁড়ায় পাঠদানের স্থান। একেই আমরা পাঠশালা বলি। তাই পাঠশালা কোনো ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না।

মাদরাসার পূর্বকালীন আরবীয় একটি সীমিত ব্যবস্থাপনা ছিল। আর ইসলামে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে রসূল কারিম (সা.) যখন দ্বীন প্রচার শুরু করেন তখন থেকে। রসূল (সা.)-এর দাওয়াত যারা গ্রহণ করতেন তাদের শিক্ষার জন্য সাফা পাহাড়ের গুহায় আরকাম নামে এক সাহাবীর বাড়ি গ্রহণ করা হয়েছিল। 'দ্বারে আরকাম' অর্থাৎ আরকামের গৃহ বলা হত একে। এখানেই সাহাবীরা একত্রিত হতেন এবং রসূল (সা.) তাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দিতেন। ইসলামের অনুষ্ঠানাদি এবং উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দিতেন।

পরবর্তীতে হিজরতের পরে মসজিদে নববী তৈরি হয়। মসজিদে নববীতে একদল লোক, একদল সাহাবী, তাঁদের মধ্যে তরুণও ছিলেন বৃদ্ধও ছিলেন, এমনকি কম বয়স্করাও ছিলেন, যারা নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন ইসলামের জন্য। অনেকেই তখনও বিয়ে-শাদী করেননি বা করলেও হিজরত করে চলে এসেছেন। আবার বিভিন্ন উপজাতি থেকেও লোক আসা শুরু হয়েছে। এভাবেই ঐ মদীনা শরীফের মসজিদের সঙ্গেই এক জায়গায় তারা থাকতেন। তাঁরা ছিলেন রসূল (সা.)-এর মেহমান। সাহাবায়ে কেরামরা তাঁদের মেহমানদারি করতেন। বা তাঁরা অনেকেই বিভিন্ন কাজ যেমন মজদুরি করতেন, কাঠ কাটতেন বা লাকড়ি সংগ্রহ করতেন। শুধু এক বেলার খাবারের ব্যবস্থা হলেই তাঁরা আর অন্য কোনো চিন্তা করতেন না। তাঁরা সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকতেন রসূল (সা.) কী বলেন বা কী করেন এগুলো সংরক্ষণের কাজে। রসূল (সা.) পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতের জন্য এদের থেকেই লোক পাঠাতেন। এছাড়া অন্যান্য কোনো কাজে বা সরকারি কাজে এদের ব্যবহার করা হত। তাঁদের বসবাসের স্থান ছিল মসজিদে নববীর আঙ্গিনা, আরবীতে একে বলা হয় 'সুফ্ফা'। তাই এখানে যারা বসবাস করতেন তারা 'আসহাবে সুফফা' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'আসহাবে সুফফা' মানে সুফফার অধিবাসী। এই হল মাদরাসার শুরু। এখানেই রসূল (সা.) তাঁদের পাঠদান করতেন, শিক্ষা দিতেন। আমাদের এখনকার সব কওমী মাদরাসা বা আবাসিক মাদরাসা যেগুলো আছে এর সবখানেই আহারেরও ব্যবস্থা আছে। রসূল (সা.) যেহেতু তাঁর শিক্ষার্থীদের আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন বা তার সাহাবীরা করেছিলেন, এই ধারা বা পরম্পরাটিকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে কওমী মাদরাসাগুলোতে আহারের ব্যবস্থা রাখা হয় মাদরাসার পক্ষ থেকেই। এর পরে বিভিন্ন জায়গায় মাদরাসা অর্থাৎ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে, যেমন কুফায়, পরবর্তীতে দামেস্কে। এরপর বাগদাদে একটি বৃহৎ সরকারি মাদরাসা তৈরি করা হয়। পরে সরকারি এবং বেসরকারিভাবেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মাদরাসা গড়ে ওঠে।

শুরুর এই মাদরাসাগুলো একই পরম্পরা বহন করে শিক্ষার্থীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করত। আশ্চর্যের বিষয় হল, বুখারা সমরখন্দে প্রাচীন যত মসজিদ আছে প্রত্যেক মসজিদের সাথে একটি করে মাদরাসাও আছে। এবং ঐ মাদরাসার সাথে আবার থাকার জায়গাও আছে। এতে বোঝা যায়, শুরুর ঐ পরম্পরা ওখানেও ছিল।

মোল্লা নিজামুদ্দীন ভারতের একজন বড়মাপের শিক্ষাবিদ এবং উচ্চ আলেম ছিলেন। এই মোল্লা শব্দটি যদিও আমাদের এখানে এখন নিন্দনীয় হয়ে গেছে,

কিন্তু মৌলিকভাবে মাওলানা থেকে মোল্লা শব্দটিই ছিল বেশি উচ্চমানের। যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিশেষজ্ঞ এবং জ্ঞানচর্চায় অত্যন্ত পারদর্শী হতেন তাকে বলা হত মোল্লা। আমাদের দেশে এখন মোল্লা শব্দটি পারিবারিক পদবিতে পরিণত হয়েছে। তিনি মাদরাসাগুলোর জন্য একটি সিলেবাস তৈরি করে দিলেন। এই সিলেবাস ভারতীয় উপমহাদেশে মানে তৎকালীন ভারতের মাদরাসাগুলোতে খুবই প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। উনার নামেই এই সিলেবাসটিকে বলা হয় 'দরসে নিজামীয়া'। এই দরসে নিজামীয়া মানে হল নিজামের পাঠ্যসূচি। এটিই তখন চালু ছিল। ব্রিটিশরা এখানে এসে ওরিয়েন্টাল কলেজ চালু করে। অর্থাৎ ইসলামী সাবজেক্টগুলি রেখে তারা কিছু কলেজ চালু করে। দিল্লিতে একটি ওরিয়েন্টাল কলেজ ছিল যেখানে দরসে নিজামীয়াই ছিল তাদের পাঠ্যসূচি।

ঐ যুগে হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ (রহ.) মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেছেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' নামে তাঁর একটি বিখ্যাত বই আছে, যা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ দেশে ব্যাপকভাবে হাদীসের চর্চা তাঁর মাধ্যমেই শুরু হয়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তাঁর ছেলে শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়েছিলেন যে, "ইংরেজদের শাসন শেষ করার সময় হয়ে গেছে, সুতরাং এখন ঘরে বসে থাকা ভারতবাসীর জন্য আর জায়েজ নেই। সবাই স্বাধীনতার জন্য বেরিয়ে পড়।"

ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় ১৭৮০ সালের দিকে মোল্লা নিজামুদ্দীনের ধারারই 'মোল্লা মজদুদ্দীন' নামে একজন বড় আলেম বসবাস করতেন কলকাতায়। ১৭৮০ সালে হেস্টিংসের সময়ে অর্থাৎ কোম্পানি আমলে তাদের দাপ্তরিক কাজগুলো ফার্সিতেই তারা জারি রেখেছিল। বিচার ব্যবস্থাও মুঘল আমলে যা ছিল তার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ এবং মুসলমানদের বিভিন্ন হতাশার কারণে দেখা গেল যে এ কাজগুলোর লোক আর পাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ মূলত ছিল মুসলমানরা তখন শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে। তখন কিছুসংখ্যক মুসলমান ওয়ারেন হেস্টিংসকে জানাল যে তিনি ভারতের একজন খুব নামকরা ইসলাম বিশেষজ্ঞ এবং অত্যন্ত বড় পণ্ডিত। তারা হেস্টিংসকে অনুরোধ করল তাকে যেন কলকাতায় রাখা হয়। তাহলে এখানে একটি শিক্ষাগার গড়ে তোলা সম্ভব। ১৭৮০ সালেই প্রথম শিয়ালদহের কাছে একটি ভাড়া বাড়িতে 'মাদরাসা' চালু করা হল যা 'মাদরাসায়ে আলীয়া' নামে প্রসিদ্ধ। এবং মাদরাসায়ে আলীয়ারও পাঠ্যসূচি ছিল ঐ 'দরসে নিজামীয়া'।

তখনও সেখানে হাদীসচর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি। হাদীসচর্চার নিচের শ্রেণি, আমাদের দেশে যাকে মিশকাত বলা হয়, এ পর্যন্ত চালু ছিল সেখানে। পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষাও চালু হয়। নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলীরাও ঐ মাদরাসায়ে আলীয়ার ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে ওয়ারেন হেস্টিংস মাদরাসা পরিচালনার ভার পুরোপুরি তাদের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে মাদরাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তখন আবার ইংরেজরা মাদরাসার পুরোপুরি দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। এবং এরপরে একাধারে সেখানকার প্রায় আট-নয় জন প্রিন্সিপাল ছিলেন ইংরেজ এবং প্রাচ্যবিদ। এদের মধ্যে অনেক ইহুদিও ছিলেন।

এই মাদরাসা তৈরির পিছনে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যে ছিল মূলত নিজেদের কিছু কর্মচারী সৃষ্টি করা। ইংরেজি শিক্ষা চালুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য যেটা লর্ড মেকলে নিজেই বলেছেন। এ দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা তাদের উদ্দেশ্যে ছিল না কোনো দিনও।

এভাবেই আলীয়া মাদরাসার সৃষ্টি হল। ব্রিটিশদের জিহাদভীতি ছিল। ঐ জিহাদভীতি দূর করার জন্য তারা সিলেবাসের মধ্য থেকে জিহাদসংক্রান্ত যত হাদীস এবং আয়াত ছিল সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা না দিয়ে সব কেটে ফেলে দেয়। অনেকটাই মাথাব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার মতো বিষয়। তাদের ঐ কাজ এ দেশের জনগণ ঠিকভাবে গ্রহণ করেনি কোনো দিন। এ কারণেই পরে এখানে কওমী মাদরাসাগুলো হয়েছে। আমাদের দেশে কওমী মাদরাসাগুলো হয়েছে দেওবন্দের সূত্র ধরেই সিপাহী বিদ্রোহের পরে। আর যারা এই মাদরাসাগুলো করেছিলেন তাঁরা কিন্তু দিল্লির ওরিয়েন্টাল কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ, মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.), মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (রহ.)– তারা সবাই প্রায় এক সময়ের ছাত্র ছিলেন। তাদের শিক্ষক ছিলেন মাওলানা মমলুক আলী (রহ.)। তাদের দুইজন দুইভাবে চিন্তা করলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ চিন্তা করলেন, ব্রিটিশদের সাথে আপস করা ছাড়া মুসলমানরা বাঁচতে পারবে না। তিনি আলীগড় ইউনিভার্সিটি গড়লেন। এটি ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু তার মূল চেতনা ছিল ব্রিটিশদের সাথে আপসকামিতার। আর অন্যরা মনে করলেন, তাঁরা আপস করবেন না, তবে তাঁরা এটাও ভাবলেন যে এখনও লড়াইয়ের সময় আসেনি। তাঁরা ভাবলেন স্বাধীনতার জন্যই তাঁরা লোক তৈরি করে যাবেন। যার কারণে তাঁরাই পরে দেওবন্দ মাদরাসা বানিয়েছিলেন।

কেন মানুষ কওমী মাদরাসায় শিক্ষা নিতে যায়?

কয়েকটি কারণ আছে। প্রধানত মানুষের মধ্যে তার ধর্মের প্রতি যে অনুরাগ সেখান থেকেই সে মনে করে যে ধর্মীয় শিক্ষাকে জাগরূক রাখা দরকার। এ বোধই তাদের মধ্যে কাজ করে প্রধানত। তাই এ রকম দেখা যায় যে, বিয়ের দিনই স্বামী-স্ত্রী প্রতিজ্ঞা করছে, তাদের প্রথম সন্তান হলে তাকে কুরআনে হাফেজ বানাবে বা তাকে মাওলানা বানাবে। এ ধরনের কিছু প্রবণতা আমাদের এখানকার মানুষের মধ্যে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, সাধারণ শিক্ষার ব্যয় বহনও সকল মানুষের জন্য সম্ভব না আমাদের দেশে। এখানে সাধারণ শিক্ষার ব্যয় অনেক বেশি। আর কওমী মাদরাসায় বলতে গেলে কোনো ব্যয়ই হয় না। আবার অনেকে মনে করে যে মাদরাসায় গেলে সচ্চরিত্রবান এবং ধর্মভাবাপন্ন একটি সন্তান পাবে তারা। আজকালকার সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের নৈতিকতাবোধকে সাংঘাতিকভাবে আহত করছে। দেখা যায় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হানাহানি, মারামারি, চাঁদাবাজি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। সাধারণ শিক্ষার এই পরিণাম দেখেও মানুষের মধ্যে অনীহা এবং ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে আমার সন্তানও কি এমন হয়ে যাবে কিনা এই ভাবনায়। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মাদরাসার ছাত্রদের দেখা যায়, তারা শান্ত, সুশীল এবং পিতা-মাতার প্রতি অনুগত হয়। এই বিষয়টিও কাজ করে অনেক অভিভাবকের চিন্তায়। তবে প্রধানত ধর্মীয় অনুরাগ থেকেই কওমী মাদরাসায় শিক্ষার হার বাড়ে।

এই ভাবনায় পরকাল বা আখিরাতের বিষয়ও প্রাধান্য পায়। কারণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ তার সন্তানদের ধর্মীয় পড়াশুনা করালে পরকালে সে কিছু সুবিধা পাবে এ বিষয়টি তো আছেই।

আলীয়া মাদরাসা ও কওমী মাদরাসার মূল পার্থক্যটা কী?

আলীয়া মাদরাসা ও কওমী মাদরাসার মূল সিলেবাসের মধ্যে মৌলিকভাবে খুব বেশি পার্থক্য নেই। কারণ দুটো সিলেবাসই মোল্লা নিজামুদ্দীনের সিলেবাস অনুসরণ করে তৈরি করা। মূল সিলেবাসকে 'দরসে নিজামীয়া' বলা হয়। তবে আলীয়া মাদরাসা কেবল বাংলা, বিহার আর আসামের কিছু অংশে আছে। পৃথিবীর আর কোথাও আলীয়া মাদরাসা

নেই বললেই চলে। এমনকি বর্তমানে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় যে সমস্ত মাদরাসা গড়ে উঠেছে এগুলোর সবই দেওবন্দের কওমী মাদরাসার নেসাব অনুসারেই গড়ে উঠেছে। আলীয়া মাদরাসা যেহেতু সরকার, বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই বরাবরই ব্রিটিশ সরকার একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করেছে। আলীয়া মাদরাসায় ধর্মীয় জ্ঞানের সাধারণ বিকাশ আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আলীয়া মাদরাসার সিলেবাসের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ের চেয়ে অন্যান্য বিষয়কে এত বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় যে প্রজ্ঞার সাথে বা গবেষণার সাথে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের সুযোগ তুলনামূলকভাবে অনেক কমে যায়। এদের পাঠ্যবই এবং পাঠ্যসূচিও অনেক নিম্নমানের হয়ে গেছে। অথচ পৃথিবীর সর্বত্রই এবং সকল ধর্মেরই আলাদা ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। যেমন খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা ধর্মযাজক হয় তারা কিছু সাধারণ পড়াশুনার পরেই ধর্মীয় পড়াশুনায় চলে যায়। প্রতিটি গির্জাতেই আলাদা ব্যবস্থা আছে ধর্মীয়ভাবে শিক্ষিত হওয়ার জন্য। ইহুদিদের মধ্যে ধর্মশিক্ষার প্রচলন আরও বেশি। ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় শিক্ষার বিশেষ সনদও দেয়। সুতরাং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি সঠিকভাবে পালনের জন্য মানুষ স্বভাবতই ধর্মীয় শিক্ষার একটি ব্যবস্থা চায়। ঠিক একইভাবে হিন্দু ধর্মের মধ্যেও যারা ধর্মযাজক হয় তাদেরও আলাদাভাবে অনেক কিছু আত্মস্থ করতে হয়। মানুষের সাধারণ ধর্মীয় বোধের জায়গা থেকেই ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজন অনুভব করে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই কওমী মাদরাসাগুলো আলাদাভাবে টিকে আছে। মানুষ ধারণা করে যে আলীয়া মাদরাসাগুলো তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনকে পূরণ করতে পারছে না।

কওমী মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বা পরিমার্জন কিভাবে হয়?

কওমী মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বা পরিমার্জন বরাবরই দেওবন্দে হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দুটো দিক আছে। একটি দিক মূল কুরআন-হাদীসের সাথে সম্পর্কিত। এগুলি ফিকাহ্, আকাইদ, বিশ্বাস ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। একে মূল বলা হয়। আর একটি আছে এ মূল বিষয়গুলো বা মূল জ্ঞান অর্জনের জন্য যা সহায়ক, যা না হলে সে ঐ জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। যেমন, ইসলাম ধর্মের দিক থেকে আরবীর জ্ঞান থাকা তার জন্য জরুরি। আরবী জ্ঞান লাভ করতে হলে তাকে আরবী

ব্যাকরণ, আরবী সাহিত্য সম্পর্কে জানতে হবে। ঠিক এমনিভাবে কুরআনে করীমের মধ্যে ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়সহ নানা বিষয়ের উল্লেখ্য আছে। তাই ন্যূনতম ভৌগলিক জ্ঞান যদি একজনের না থাকে তাহলে সে কুরআনে করীমের অর্থ বুঝবে না। ঐতিহাসিক জ্ঞান না থাকলে সে সঠিকভাবে ইতিহাসের পরম্পরাগুলোও বুঝতে পারবে না। ঐ সহায়ক বিষয়গুলোর মধ্যে পরিবর্তন এসেছে সময়ে সময়ে। মূল বিষয়গুলোর মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগের সিলেবাসে যেসব সাহিত্য ছিল এখন তাতে নতুন আরও সাহিত্য যুক্ত হয়েছে। তারা সিলেবাসের ভিতরে এসব অন্তর্ভুক্ত করেছে বিভিন্ন সময়ে। তবে আগে কওমী শিক্ষা উর্দুনির্ভর ছিল, কারণ দেওবন্দ ছিল উর্দুভাষী। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা ঠিকই ছিল, কারণ তাদের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। আমাদের এখানকার অনেকেই সেখানে উর্দুতে পড়ে এসে এখানেও ঠিক ওই উর্দুরই প্রচলন রেখেছিলেন। কিন্তু এখন আর আমাদের দেশের কওমী মাদরাসায় উর্দু মাধ্যম নেই। তবে প্রমিত বাংলার প্রচলন এখনও ভালোভাবে হয়ে ওঠেনি। তাই বাংলা সাহিত্য এখন সিলেবাসে আনা হচ্ছে। এমনকি অনেক মাদরাসায় এখন এস.এস.সি পর্যন্ত ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞানও চালু হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক পরিবর্তন এসেছে এই সিলেবাসগুলোতে। এই পরিবর্তন এসেছে দুটি পরিপ্রেক্ষিতে। একটি পরিপ্রেক্ষিত হল মূল যে শিক্ষা–কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ও আকাইদ এগুলো বোঝার জন্য, আর সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেও একটি পরিবর্তন হয়েছে। তবে যেহেতু একক কোনো নিয়ম নেই তাদের, তাই এই পরিবর্তনটির অনেকটাই বিশৃঙ্খল হয়েছে। একেকজন একেকভাবে তাদের মাদরাসাগুলোর সিলেবাস সাজাচ্ছে এবং পরিচালনা করছে। তাদের মধ্যে সমন্বয় দরকার।

এই সমন্বয়ের সবচেয়ে বড় পথ হল, কওমী মাদরাসাগুলোকে একই নেযাম ও ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা। যেহেতু কওমী মাদরাসাগুলো স্বাধীনভাবেই পরিচালিত হয়, তাদের মূল যে কারিকুলাম আছে তা বজায় রেখেই একটি স্বাধীন ব্যবস্থা যদি তৈরি হয় তাহলে মনে হয় মাদরাসাগুলোও তা মেনে নিবে এবং এ বিষয়টিকে সন্দেহের চোখে দেখবে না। তাদের এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যে সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তাদের স্বকীয়তা নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাই এ জন্য তাদের স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তা সংরক্ষণ করে যদি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করা যায় তাহলেই এই শিক্ষা ব্যবস্থাটির সমন্বয়ও সাধিত হবে এবং পুরো ব্যবস্থাটিই সুবিন্যস্তভাবে অগ্রসর হবে।

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

জন্ম ১৯৫০ সালের ৭ মার্চ কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার বেলঙ্কায়। বাবা মাস্টার আবদুর রশীদ কিশোরগঞ্জের জাওয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মা সৈয়দা জেবুন্নেসা ছিলেন গৃহিণী। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন কিশোরগঞ্জের জামি'আ ইমদাদিয়ায়। কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ভারতের 'দারুল উলূম দেওবন্দ' থেকে।

শিক্ষা শেষে শুরু করেন হাদীসের গবেষণা ও অধ্যাপনা।

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে।

স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশে ঢাকার জামি'আ মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ফরিদাবাদ মাদরাসা, মালিবাগ জামি'আ, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, জামি'আ ইকরাসহ অসংখ্য মাদরাসায় হাদীসের দরস দেন এবং 'শাইখুল হাদীস'-এর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৭ সালে যোগ দেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে। পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেন অনুবাদ ও সংকলন, প্রকাশনা, গবেষণা বিভাগের পরিচালকের। সর্বশেষ দায়িত্বে ছিলেন ইমাম ট্রেনিং একাডেমী পরিচালনার। ২০০২ সালে চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রিসভায় যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে মন্ত্রী করার প্রতিবাদে স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ করেন।

ঐতিহ্যবাহী আরব প্রকাশনা সংস্থা 'দারুল হাদীস' থেকে প্রকাশিত হয়েছে আরবী ভাষায় রচিত 'রাওয়ায়ে মিন আশআরিস সাহাবা'। এছাড়া তিনি মাতৃভাষায় লিখেছেন 'ইসলামে শ্রমিকের অধিকার'-সহ শতাধিক গ্রন্থ। ইসলামে শ্রমিকের অধিকার গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে এবং উর্দু অনুবাদ পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের জন্য গবেষণা বিভাগে ঐতিহ্য ফাউন্ডেশনের 'হাজী শরীয়তুল্লাহ স্বর্ণপদক ২০০৮' লাভ করেন। ১৯৮৬ সাল থেকে 'মাসিক পাথেয়' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করছেন।

১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইকরা বাংলাদেশ', সাধারণ ও ইসলামী শিক্ষার পরিকল্পিত সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে। সারা দেশে এখন যার ২৬টি শাখা।

ভারতের অবিসংবাদিত আধ্যাত্মিক রাহবার, 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' ভূষিত সাইয়্যিদ আসআদ মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম খলিফা মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ।

এছাড়া তিনি এনসিটিবির রিভিউ কমিটি, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামা-এর চেয়ারম্যান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কওমী মাদরাসা শিক্ষা কমিশনের কো-চেয়ারম্যান, জাতীয় যাকাত বোর্ডের সহ-সভাপতি, উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত 'শোলাকিয়া ঈদগাহের' গ্র্যান্ড ইমাম, জামি'আ ইকরা বাংলাদেশ-এর শাইখুল জামি'আ ও শাইখুল হাদীস, ইসলামী গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইসলাহুল মুসলিমীন পরিষদ বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি অসংখ্য স্কুল, মাদরাসা, মসজিদ, ইয়াতিমখানা, বিধবাপল্লিসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে গবেষণামূলক কনফারেন্স ও সেমিনারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সৌদি আরব, কাতার, জাপান, দুবাই, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে গবেষণামূলক কনফারেন্সে অংশ নিয়েছেন। সম্প্রতি লক্ষাধিক আলেম, মুফতী ও ইমামের স্বাক্ষর সম্বলিত মানবকল্যাণে শান্তির ফতওয়া দিয়ে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

ব্যক্তি জীবনে মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ৩ পুত্র ও ১ কন্যার জনক।

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত 'শোলাকিয়া'র গ্র্যান্ড ইমাম মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদের জন্ম ১৯৫০ সালে। ভারতের বিখ্যাত 'দারুল উলূম দেওবন্দ' থেকে স্নাতকোত্তর। মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মাসউদ ২০০২ সালে চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রিসভায় একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রী করার প্রতিবাদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ করেন।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ সাইয়্যিদ আসআদ মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম খলিফা মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ বর্তমানে বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামা-এর চেয়ারম্যান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কওমী মাদরাসা শিক্ষা কমিশনের কো-চেয়ারম্যান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় যাকাত বোর্ডের সহ-সভাপতি, জামি'আ ইকরা বাংলাদেশ-এর শাইখুল জামি'আ ও শাইখুল হাদীস, ইসলামি গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইসলাহুল মুসলিমীন পরিষদ বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি অসংখ্য স্কুল, মাদরাসা, মসজিদ ও ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠায় সম্পৃক্ত ছিলেন।

কিছু কথা

বইটি সবার খেদমতে পেশ করলাম।

যাতে করে আপনি নিজে উপকৃত হবেন, অন্যকে উপকৃত করবেন। আর ভুল হলে, ক্ষমার দৃষ্টিতে

দেখবেন ও আমার জন্য এই দুয়া করবেন,যাতে রব্বুল আলামিন তার মনোনীত ধর্মের খাদেম হিসাবে

কবুল করেন। (আমীন)

এবং

সেই ভাইদের প্রতি,যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে,করবে কিংবা করবে।

--আবদুল্লাহ--